প্রেম-যোগ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর আবেশে

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রকাশক—মহেন্দ্র

শ্রীঅঙ্গন—ফরিদপুর।

শকাতীতাব্দা ১৮৩৮, শ্রাবণ।

[মূল্য ৮০

উৎসর্গ।

যাঁহার রচিত ফুল
মানুষ তাঁহারই চরণে অঞ্জলি দিয়া
বাসনা চরিতার্থ করে।
এই
প্রেম-কুসুম যাঁহার করুণার বৃন্তে প্রস্ফুটিত
সেই
শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরের
চরণ-কমলে উৎসর্গ করিলাম।

দাসানুদাস—
যোগেন্দ্র।

শুদ্ধিপত্র

প্রথম খণ্ড।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
ক	শেষ	পসরিয়া	পসারিয়া
৩	৩য়	জগদ্বন্ধু সুন্দরের	জগদ্বন্ধু সুন্দর
৫	৩। ২য়	তৃতীয় পক্ষে	তৃতীয় পক্ষ
৬	শেষ	স্বার্থপরগণ	স্বার্থপর
৯	৬ষ্ঠ	পড়িয়া	গড়িয়া
১২	৪র্থ	ভাবরাশি	আপনার ভাবরাশি
১৪	৬ষ্ঠ	এ অভ্রান্ত	অভ্রান্ত
১৪	২। ২য়	ফেলিলে	ধরিয়া ফেলিলে
১৮	৩। ১০ম	আবর্ত্তনেব	আবর্ত্তনে
২০	শেষ	শাকে	শোকে
২১	৪। ২য়	জন্তুও	জন্তু
২৩	১৪শ	কোন	কোন্
২৩	২। ২য়	আমার আমার	এত আমার আমার
২৫	২। ৩য়	এত সে	সে
২৩	২। শেষ	ছাই	ছাই ;
২৭	৩য়	জীব জীবকে	জীবকে
২৭	৩। ২য়	আদেশ	আদেশে
২৭	৪। ২য়	তাড়িতে	তারিতে
২৮	৩। ৪র্থ	গোয়ালন্দের	গোয়ালা-নন্দেব
২৮	৪। ২য়	পদার্থ	পদার্থে
৩০	১। ৪র্থ	কোল্ কি	কোন্‌টি
৩০	৫। শেষ	বশ্বময়	বিশ্বময়
৩১	২য়	ভক্তি	শক্তি
৩১	২। ১ম	ষড়ৈশ্চয্য	ষড়ৈশ্বর্য্য
৩১	৪। ৮ম	এই পর্য্যন্ত	এই পর্য্যন্ত।
৩২	৩। ৬ষ্ঠ	ধার	ধারা
৩২	৩। ৬ষ্ঠ	নিস্পুত	নিখুঁত
৩২	৩। ১০ম	তাহা জগতের	তাহা
৩৬	২। ৪র্থ	তরুরপি	তরোরিব
৪৩	২। ১০ম	পতিগতা	পতিগত
৪৮	২। ৯ম	পার	পায়
৪৮	২। ৯ম	করিয়াত	করিয়া
৫১	৯ম	যে প্রতিনিয়ত	সে প্রতিনিয়ত
৫২	৬ষ্ঠ	মন-প্রাণ-প্রাণ-পতি	মন-প্রাণ প্রাণ-পতি

সংশোধন করিয়া লইয়া পরে পাঠ করিলে ভাব ও অর্থ বোধে ব্যতিক্রম ঘটিবেনা।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৪	২। ৯ম	ভাব-সম্ভোগ	ভাব
৫৫	৫ম	কাণ্ডভাব	কান্তভাব
১৮	২। ৬ষ্ঠ	সঙ্কোচ করিয়া	সঙ্কোচ
৬৩	২। ৮ম	নিরত	অবিরত
৭৬	৯ম	প্রেমময়ী গোপী	প্রেমময়ী
৭৮	২। ১ম	দোষ নাই	দোষ নাই।
১৩৭	৪র্থ	ত্রিণাত্মত	ত্রিগুণাত্মক
১৬৫	২য়	ব্রজবাস	ব্রজবাসী
২৩৫	২। ৫ম	করিয়	করিয়া
২৪৬	৬ষ্ঠ	বা	রা
২৭৭	৮ম	অনুরাগেও	অনুরাগে
২৮৮	১১শ	কক্ষমল	বক্ষমল
২৯৫	২। ১১শ	রমণী	রমণীয়
৩০৩	৪র্থ	পারে ন	পারে না
৩২০	২। ২য়	বাসন	বাসনা
৩২১	৬ষ্ঠ	থাকে	থাক
৩২৯	১৩শ	সংবরণ	স্মরণ
৩৩৩	৮ম	শখে	শঙ্খে

দ্বিতীয় খণ্ড।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৬	১ম	ভগবতত্ত্ব	ভগবত্তত্ত্ব
৫	৩য়	গোলক	গোলোক
১৫	টীকা ৩য়	গেবগণ	দেবগণ
১৩	৩। ২য়	অদ্বেত	অদ্বৈত
৬২	২য়	নিমাই	নিতাই
৬৭	১ম	শান্তিপুরের	শান্তিপুরেশ্বর
৬৭	২। ৪র্থ	অন্ময়	তন্ময়
১০৫	২। ৭ম	হাবুড়ু	হাবুডুবু
১১১	৫ম	টুক	টুক্
১১২	১২শ	হরিনাম-হরিনামক	হরিনাম হরিনামক
১২১	১৪শ	ক্রেড়ে	ক্রোড়ে
১২৬	কবিতার ২য়	শরীর	শচীর
১৩০	১১শ	অমি	আমি
১৪৫	২। ৯ম	কৃপায়	কৃপা
১৪৫	২। ১০ম	প্রভাবে	প্রভাব,
১৫৮	১। ১৯শ	অবস্থায়	অবস্থা
১৯২	২০শ	ভাগড়ে	ভাগাড়ে
২০০	৫ম	সেবায়	সেবার

প্রেম-যোগ

তৃতীয় খণ্ড।

মহা-উদ্ধারণ-লীলা।

ব্রজলীলার পরিকর পঞ্চ-সম্মিলনে,—
পঞ্চতত্ত্ব,—গৌরের প্রেম-প্রচারণে।
পঞ্চতত্ত্ব একাধারে প্রেমের প্লাবন,—
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহা-উদ্ধারণ।

ধন্য ধন্য কলি-যুগ সর্ব্ব-যুগ-সার,
ভূলোক গোলোকধাম হইবে এবার।
হরিনামে রাধাপ্রেমে ভরিবে ভুবন,
আনন্দে নাচিবে হিন্দু-ইংরেজ-যবন॥

শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছেন—এবার বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।

ইতি মহা-উদ্ধারণ-লীলা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ।।

একাধারে পূর্ণলীলা মহা-উদ্ধারণ

শিশু প্রেস

প্রেম-যোগ

তৃতীয় খণ্ড।

প্রেমের প্লাবন।

অবতারণ-সূচনা।

শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমলীলায় জগৎ ও জগৎবাসীকে ধন্য করিয়া জীব-উদ্ধারণের সহজ সরল মধুর ভাবে,—হরিনামে ও রাধাপ্রেমে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া সপরিকরে গোলোকধামে চলিয়া গেলেন। জগৎ প্রেমানন্দে মাতিয়া মেঘ-মুক্ত শশধরের মত, রাধাকৃষ্ণের চরণসেবিত রজবিমণ্ডিত প্রফুল্ল পঙ্কজের মত, অপ্রাকৃতসৌরভে অপার্থিব গৌরবে দশদিক্ আমোদিত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ধর্ম্মের পবিত্র আলোকে সর্ব্বত্র আলোকিত হইল—সর্ব্বত্র প্রেম, সর্ব্বত্র আনন্দ, সর্ব্বত্র সুখ ও সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, ক্রমে আবার কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিল; আবার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে বসিল, সর্ব্বত্রই অনাচার, ব্যভিচার, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি, ভগবানে অবিশ্বাস, ধর্ম্মে অনাস্থা, সত্যনিষ্ঠা পদদলিত হইতে লাগিল। আবার ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মকে, কর্ম্মের নামে অকর্ম্মকে, বিদ্যার

নামে অবিদ্যাকে, জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতাকে বরণ করিয়া জগজ্জীব. লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, প্রেত পিশাচের বিভৎস হাহাকারে, নরকপানে ছুটিয়া চলিল। সর্ব্বত্রই পাপপ্রসঙ্গ, সর্ব্বত্রই পরপীড়ন, সর্ব্বত্রই পরের মুখে চূণকালি, পরের বুকে বসিয়া রক্তপান, আত্ম-প্রতিষ্ঠার পদতলে পরের মুণ্ড বলিদান!! আজ ভগবৎ-প্রসঙ্গ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম রসাতলে চলিল, কলির পূর্ণ প্রতাপে পাপের পীড়নে ধরা টলমল হইয়া উঠিল! আজ কোথায় গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা, কোথায় সেই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, আর কোথায় বা সেই অপ্রাকৃত প্রেমের প্লাবন!! আজ গৌরের প্রেমলীলাতে নানা ব্যভিচার, নানা বৈদিক ও তান্ত্রিক ভাব পুঞ্জীকৃত হইয়া পরম পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম, নেড়ানেড়ীর ঘৃণিত কামক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আজ রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা, আমাদের মত কামুক জীবের উপহাসের দৃষ্টান্ত মধ্যে গণ্য হইয়াছে! আজ কথায় কথায় লোকে আঁখি ঠারিয়া ওষ্ঠ টিপিয়া বলিয়া থাকে,—"দেবতার বেলা লীলা খেলা; পাপ লিখেছে মানুষের বেলা!!" ছি! ছি! ছি! ইহা হইতে আর ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কাহাকে বলে? আজ মানুষ, সত্যধর্ম্ম ও প্রেমময় ভগবানকে ভুলিয়া গিয়া একেবারে অধঃপতনের চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! আজ মানুষ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া আহার, নিদ্রা, মৈথুনকেই জীবনের লক্ষ্যস্থানীয় করিয়া প্রেতের অভিনয়ে নরকপানে

ব্রজলীলার চারি হাজার বৎসর পরে আবার গোপীকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ রূপে জীব-উদ্ধারণে আসিতে হইয়াছিল। এবার চারিশত বৎসরেই আবার আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে। গৌরাঙ্গলীলার সময় ম্লেচ্ছের অত্যাচার হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আংশিক স্থানের ভিতর দিয়া প্রেমলীলা প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, এবার সমস্ত জগৎময় ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, কলির কুটিল কালচক্র ঘূর্ণায়মাণ! আজ সর্ব্বত্রই প্রলয়ের বিশ্বব্যাপী সংহার মূর্ত্তি!! সর্ব্বত্রই অধর্ম্মের জয়, পাপীর জয়, দস্যুর জয়, মিথ্যা প্রবঞ্চনার জয়, পরনিন্দার জয়, পরপীড়কের জয়, ব্যভিচারের প্রশ্রয়, হরিকথার লয়—জগৎময় মহাপ্রলয়! সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গ্লানি, ধার্ম্মিকের গ্লানি, সত্যনিষ্ঠাও পবিত্রতার হানি। সর্ব্বত্রই পাপপ্রসঙ্গ রঙ্গভঙ্গের উত্তাল তরঙ্গ; ভগবৎপ্রসঙ্গ, সৎসঙ্গ চিরসাঙ্গ! সর্ব্বত্রই অন্তঃসারশূন্য মাকাল ফলের আদর, মণিমুক্তা পদদলিত, পথের কাঁকর! আজ সাধু-সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের আখ্যা হইয়াছে—পাগল! হরিনাম ও সাধন ভজন হয়েছে—পাগলামি—বিকৃত মস্তিষ্কের ভণ্ডামি!! হায় হায়! আজ কামাশক্ত ব্যভিচারী আমরা ব্রজলীলার ব্যাখ্যা করিতেছি—গোপীকৃষ্ণের ব্যভিচার! গৌরলীলার ব্যাখ্যা করিতেছি—"ছোটলোকের, খোল-করতাল লইয়া অসভ্যের মত চীৎকার!!" এগুলিকে আইনের আমলে আনিয়া বন্ধ না করিতে পারায়, আজ কত জন অবিরত জ্বালাময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কটমট করিয়া চাহিতেছেন!! এই পর্য্যন্তই

শেষ নহে, ইহার উপরে আরও উঁচু গলায় বলিয়া থাকেন—"শ্রীকৃষ্ণ,—রেখে দাও ও সব কথা!—সেই গোয়ালার ছেলে ত! কতকগুলি মেয়েমানুষ নিয়ে কেলেঙ্কারী ক'রে হ'লেন ভগবান।" গৌরাঙ্গ, জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে, দুটা বিবাহ ক'রে, শেষে যুবতী স্ত্রীটাকে ঘরে রেখে, হলেন সন্ন্যাসী!! আরে বাপু যদি সন্ন্যাসী হওয়ার অত সাধ ছিল, তবে শেষ বিবাহটা কর্‌লি কেন? কত বড় অন্যায়! যে এমন ক'রে যা তা ক'রতে পারে, তিনি হলেন আবার আর এক ভগবান!! রামচন্দ্র!! তাও বেশ জানি, দশরথের বেটা ত? এমন অজ্ঞ আর সংসারে নাই। একটা লোক আসিয়া বলিল—"প্রজাগণ রাবণের গৃহে বাসের কথা লইয়া সীতাসম্বন্ধে কাণাকাণি করে।" আর যায় কোথা! অমনি কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির! তারপরে বিনা বিচারে গর্ভবতী অবস্থাতেই পবিত্র-চরিত্রা সীতাকে একেবারে বনবাস!! এ সব বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যাপার জানিয়া শুনিয়াও অন্ধ-বিশ্বাসীগণ তাঁহাকে বলিবে ভগবান!! পাঠক মহাশয় শুনিলেন ত? ইতি—কলির শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও অবতার তত্ত্ব!!

আজ আমরা মায়ামুগ্ধ জীব আত্মতত্ত্ব-বিস্মৃত। আমি আমি করি, আমি কে জানি না, বুঝি না। কিন্তু নিজকে না বুঝিলেও ভগবান ও অবতারকে কথায় কথায় বিকৃত ব্যাখ্যায় উড়াইয়া দিতে ছাড়ি না! কখন বলি সাকার, কখন বলি নিরাকার, আবার কখনও নাস্তি বলিয়া উড়াইয়া দেই।

আজ আমরা কলির বিজয়-নিশান উড়াইয়া, জীবত্বের

অভিমানরূপ অন্ধতায় মজিয়া, তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হইয়াও তাত্ত্বিক, অবিদ্যা লইয়া বিদ্বান, অজ্ঞানতা লইয়া জ্ঞানী, অধর্ম্ম লইয়া ধার্ম্মিক, অকর্ম্ম লইয়া কর্ম্মী, চক্ষুহীন হইয়া দার্শনিক, মূক হইয়া তর্কবাগীশ, স্মৃতিহীন হইয়া স্মৃতিরত্ন, মাথাশূন্য হইয়াও পঞ্চানন, অন্যায়ে ডুবিয়াও ন্যায়রত্ন, যোগ না করিয়াও যোগেন্দ্র, কবিত্ববিহীন হইয়াও কবি-রাজ !! সব ফাকি ; আগাগোড়াই ফাকি। নামেও ফাকি, কামেও ফাকি, আসলেও ফাকি, নকলেও ফাকি ! সব ফাকা, সব ফাকি ! সব কলির কাল-মাহাত্ম্য ! ধন্য কলি, তোমার রাজত্বে মানুষকে এমনি ভাবেই অমানুষ করিয়া—ভূতপ্রেত গড়িয়া, আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছ !! ধন্য আজ কলির খেলা—ধন্য ধন্য সব কলির চেলা !! আজ সভা জয় করিবার জন্য পণ্ডিত শিখেন ফাকি। যিনি আইনের কুটিল ব্যাখ্যাতে ফাকি দিয়া বিপক্ষকে যত পরাস্ত করিতে পারেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত, তাঁহার পসার তত বেশী। যাঁহার কুটিল ব্যাখ্যার আবরণে অপরাধীর মুক্তি ও নিরপরাধীর দণ্ড, তাঁহার দর্শনি হাজার টাকা !! বাহিরে গাড়ী-ঘোড়া, জুড়ি-জোড়া ভিতর সব ফাকা ! আমি আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ কবিরাজ, আমি ধন্বন্তরি ডাক্তার, আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধার্ম্মিক, আমি গুরু, আমি উদ্ধারকর্ত্তা—প্রত্যেকেই এইরূপ এক একখানা জয়পত্র কপালে বাঁধিয়া রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়ার মত দিগ্বিজয় করিতে দৌড়িয়া দৌড়িয়া পৃথিবীটা বিচরণ করিতেছি !! মূলে ভুল, গোড়ায় গলদ, আসলে ফাকি। সবই অবিদ্যার

আবরণ, অভিমানের আস্ফালন! মায়ার কুহকতান, প্রলয়ের অভিযান !!

তাই বলিতেছিলাম, আজ প্রকৃত মনুষ্যত্ব নাই, ধৰ্ম্ম নাই, ধার্ম্মিক নাই, সত্যনিষ্ঠা পবিত্রতা নাই, শুধু অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আর যেন তেন প্রকারেণ জয়পত্র ললাটে বাঁধিয়া সকলেই দিগ্বিজয় চান! সকলেই চান,—পরের বুকে বসিয়া রক্তপান! আজ পরের মাংসে মাংস বৃদ্ধি করিতে, পরের শোণিত শিরায় শিরায় প্রবাহিত করিতে সকলেই ব্যস্ত! জগতের এই অধঃপতনের দিনে আজ কিছুই নাই, আবার বাজার চলন হিসাবে, কাজীর কিতাবের হিসাবের মত * আছে ত সবই,—ধার্ম্মিক আছে, পণ্ডিত আছে, সাধু আছে, বৈষ্ণব আছে;—সবই আছে, অথচ মূলে কিছুই যেন নাই। আছে ত সবই, কিন্তু সকলেরই কলির রাজ্যে বাস, সকলেই কলির অধীন; কলির উপর প্রভুত্ব কাহারও নাই। সকলেই কলির দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে স্রোতের তৃণের মত অধর্ম্মের আবর্ত্তে ভাসিয়া চলিয়াছে! প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলে, আজ প্রায় সকলেরই ভিতর ফাক !! কলির কালমাহাত্ম্যে আজ আমরা মনুষ্যত্ববিহীন মানুষে, পাণ্ডিত্যবিহীন পণ্ডিতে, ধৰ্ম্মবিহীন ধার্ম্মিকে জগৎটা পূর্ণ করিয়া কলির জয় জয়াকার করিয়া ফেলিয়াছি! বাহিরে জাঁক জমক কিন্তু ভিতরে ছাই—ভস্ম—মাটি!—

মাটির পুতুলে রতনভূষণে কর যত পরিপাটি,
যতই সাজাও মণিমুক্তা দাও, যে মাটি সেই মাটি।

* কাজীর গরু কিতাবে আছে গোয়ালে নাই।

আজ আমরা কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই কলির করালকবলে নিষ্পেষিত হইয়া অবিরত মহাপ্রলয়ে * দলিত মথিত লাঞ্ছিত হইয়া লক্ষ্যহীন পথে অধর্ম্মে অকর্ম্মে মজিয়া হাহাকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছি! একে অধর্ম্মের ব্যভিচার, তদুপরি প্রলয়ের হাহাকার! আজ ভিখারীর পর্ণ-কুটীর হইতে সম্রাটের রাজনিকেতন পর্য্যন্ত, দীন-দুঃখী হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত, সকলেই প্রলয়পয়োধিজলে তৃণের মত কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া ভাসিয়া তলিয়া হাবুডুবু খাইতেছে! কাহারও শান্তি নাই, কোথাও সুখ নাই। সকলেরই এক অবস্থা! সমস্ত জগৎই কলির আবর্ত্তে, প্রলয়ের বিবর্ত্তে বিদলিত হইয়া দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছিয়াছে! সর্ব্বত্রই খাদ্যাভাব, অর্থাভাব, তদুপরি ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বসন্ত ও ওলাউঠার প্রবল প্রভাব! তাহার উপরে চোর, দস্যু প্রভৃতি দুর্বৃত্তের দিবা-দ্বিপ্রহরেই অত্যাচার! আবার ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, ঝটিকাবর্ত্তে, যুদ্ধে বিগ্রহে অগণিত প্রাণসংহার! জগৎময় গগনভেদী হাহাকার!! সর্ব্বত্র প্রলয়ের বিকাশ! সর্ব্বত্র অশান্তি ও হাহুতাশ!! কেবা কাহাকে রক্ষা করে? আর কেবা কাহাকে শান্তি দান করে? আজ প্রজা হইতে শান্তিরক্ষক রাজাকে পর্য্যন্ত এই প্রলয়প্লাবনে পড়িয়া ভাসিতে হইতেছে! এই কলির করালগ্রাস হইতে—প্রলয়ের নিষ্পেষণ হইতে—দৈবের হাত হইতে মানুষের পরিত্রাণের উপায় কি? জন্মমৃত্যু, উত্থানপতনের অলঙ্ঘ্য-নিয়তির বাহিরে দাঁড়াইবার

---

* মহাপ্রলয় কলিরই সহচর।

মানুষের সাধ্য কি? কালের কুটিল চক্রের ভীষণ প্রলয়ঙ্কর নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে মানুষের শক্তি কি? সমস্ত জগৎ আজ অশান্তির দাবদাহনে জ্বলিয়া পুড়িয়া হাহাকার করিয়া ভগবানের কৃপাকটাক্ষ প্রার্থনা করিতেছে! রোগে-শোকে, দুঃখে-দারিদ্র্যে ছটফট্ করিয়া হা শান্তি হা শান্তি করিতে করিতে, শান্তিময় ভগবানের চরণে আশ্রয় লইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে! সকলেই প্রলয়ের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, মঙ্গলময় শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্য কাতর-প্রাণে প্রার্থনা করিতেছে! আজ রাজা, প্রজা, ধনী, দুঃখী সকলেই পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল, সকলেই শান্তিপ্রয়াসী, সকলেই শান্তিময় ভগবৎ-কৃপালাভের জন্য ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পরিত্রাহি পরিত্রাহি বলিয়া ডাকিতেছে!! আজ জগৎবাসী সকলেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রাণ খুলিয়া হা ভগবন্! হা ভগবন্! বলিয়া করুণ ক্রন্দন করিতেছে!! গৌরের অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে এক অদ্বৈতের হুহুঙ্কারের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

"নিদ্রিত আছিনু মুই ক্ষীরোদ সাগরে,
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে।"

আর এবার বিশ্বব্যাপী মহাপ্রলয়ের আক্রমণে জগৎময় পরিত্রাহি রোল! জগৎময় ভগবানের আবির্ভাবের প্রার্থনা! আজ শান্তিহারা নরনারী শান্তিময়ের প্রেমের ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অবিরত করুণকণ্ঠে বলিতেছে,—

হে জগতের বন্ধো! হে অনাথশরণ! শীঘ্র এস! শীঘ্র আসিয়া প্রলয়পয়োধিজলে নিমজ্জিত জগৎকে ধৃতবানসি!—শীঘ্র এস—

প্রলয়পয়োধিজলে যায় বিশ্ব রসাতলে,
পতিত জগতে ত্বরা এসে নাথ কর কোলে!

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলেই আজ সমস্বরে ভগবানের আবির্ভাব প্রার্থনা করিতেছে। আমরা এই জগৎময় ভগবানের আবির্ভাবের প্রার্থনা ঘোষণা, শাস্ত্রের প্রমাণ ও ভক্তগণের দৈব-অনুভূতি উল্লেখ করিয়া জগতের এই দুরবস্থার দিনে জগতের বন্ধু শ্রীভগবানের আবির্ভাবটি জগৎকে জানাইতে চেষ্টা করিব। এস্থলে ষ্টার ইন্ দি ইষ্ট্ (Order of the Star in the East) নামক সঙ্ঘের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই সঙ্ঘে নানা ধর্ম্মাবলম্বী প্রায় ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রতিদিন করুণকণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন,—

Come with the might of Thy Love, come in the splendour of Thy power, and save the world which is longing for Thy coming.

"এস প্রভু! তোমার প্রেমের শক্তিতে, তোমার ঐশ্বর্য্যের মহিমায় এস, এই আর্ত্ত জগৎকে পরিত্রাণ কর।"

আজ এই বিপদের দিনে, প্রলয়-পীড়নে নিপীড়িত হইয়াই যে, জগৎবাসী শুধু বিপদবারণ জগতের বন্ধুটির আবির্ভাব প্রার্থনা করিতেছে তাহাও নহে। আজ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তত্ত্বদর্শীগণই ধ্যানযোগে ও জ্ঞানযোগে, অভ্রান্তরূপে ভগবানের

আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন! আজ ভগবানের আবির্ভাব সকলেরই প্রাণের সহজ অনুভূতির ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া একবাক্যে বলিতেছেন,—"সত্বরই শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইবে।" প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষগণই তাঁহার আবির্ভাব অভ্রান্তরূপে অনুভব করিয়া দৃঢ়তা সহকারে জগতে শুভসমাচার জ্ঞাপন করিতেছেন। আজ জগৎময় করুণ-কণ্ঠের পরিত্রাহি রোলের সহিত, এই মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-ঘোষণা মিলিত হইয়া তাঁহার মহাবতরণটি বিশেষভাবে সূচনা করিতেছে। আবার প্রত্যেকের এই অনুভূতি দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তর হইবার,—অভ্রান্তরূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার, বিশেষ কারণ ভূতপূর্ব্ব অবতারগণের ভবিষ্যদ্বাণী। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির ভবিষ্যদ্বাণী যে নিশ্চয়ই অভ্রান্ত ও ধ্রুবসত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আজ সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রত্যেকের প্রাণের অনুভূতি আরও প্রস্তরফলকে অঙ্কিতবৎ দৃঢ় বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং,
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য অনুসারে নিশ্চয় অবধারিত রহিয়াছে, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় হয়, তখনই তিনি

আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। আজ সমস্ত জগৎময় যেরূপ ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই যে অবতীর্ণ হইয়া জগৎময় শান্তি সংস্থাপন করিবেন, আমরা এ আশা অভ্রান্তভাবে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি। কেন না স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্যসত্য অভ্রান্ত বাক্য ধরিয়া হিন্দুগণ বড় আশায় বুক বাঁধিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। আপনারা অভ্রান্তরূপে জানিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া আজ এই জগৎময় অশান্তি ও ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে জগৎকে শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন,—মাভৈ! তিনি সত্বরই পরিত্রাণায় পাপীণাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতিং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় এবার কলিযুগে অবতীর্ণ হইতেছেন। দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমন অধর্ম্মের দলন করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবার পাশ্চাত্য জগতের মহা-কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের ভিতর দিয়া তেমন জগৎময় মহাশান্তি-রাজ্য সংস্থাপন করিবেন। এ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসিনী মেডাম আবিষ্ট অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছেন—"বর্ত্তমান মহাসমর ভাবী নবযুগের সূচক। এই যুদ্ধাবসানে খৃষ্ট হইতে অধিক শক্তিসম্পন্ন কোন অবতার পূর্ব্বদেশ হইতে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত জগতে চিরদিনের জন্য শান্তি ও প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করিবেন। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার আবির্ভাবে নূতন জ্ঞানের আলোকে জাগরিত হইবে।"

আজ হিন্দুগণ আপনাদের অনুভূতি ও শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণীর

সহিত মেডামের আবেশবাণী সাদরে বরণ করিয়া লইয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে পুষ্পমাল্য ও পাদ্যার্ঘ্য হাতে লইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এরূপ আশা করিবার আরও বিশেষ কারণ এই শ্রীগৌরাঙ্গ শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন,—

"আর দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

আবার ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,—

এই মত আরও আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তোমা সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবে মহাসুখে আমা সঙ্গে।"

শ্রীগৌরাঙ্গের এই শ্রীমুখের বাক্য অনুসারে বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনুভূতি অভ্রান্তরূপে হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী কখনও বিফল হইবার নহে। তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য যে নিত্যসত্য ও অভ্রান্ত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মুসলমান রাজত্বের সময় যিনি, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাকল্পে অধর্ম্ম দলন করিয়া, প্রেমের শান্তি-সমুদ্রে পৌঁছিবার ভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আজ জগৎময় এই অধর্ম্মের পীড়নে ও প্রলয়ের নিষ্পেষণে তিনি যে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম-পয়োধির শান্তিময় প্লাবনে জগৎকে ডুবাইয়া দিয়া আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিবেন তাহার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্থান

বিশেষের ও সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষুদ্র হাহাকারে, যে প্রেম-পারাবার উদ্বেলিত হইয়াছিল, আজ সমস্ত জগতের, সমস্ত জাতির, সমস্ত জগৎবাসীর করুণ হাহাকারে, কলি ও প্রলয়ের পূর্ণ অত্যাচারে কি সেই প্রেমময় স্থির থাকিতে পারেন? তাই আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীই আমাদিগকে অভ্রান্তরূপে বলিয়া দিতেছে, তিনি আসিয়াছেন, আর ভয় নাই, শীঘ্রই সমস্ত পৃথিবী এবার হরিনামে ও রাধা-প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইবে। এস্থলে পরমহংস বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দের লীলাম্বুধিনামক গ্রন্থ হইতে তাঁহার অভ্রান্ত অনুভূতিসূচক শ্রীভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় মহাবাক্যটি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উক্তিতে ঘোষণ করিতেছেন—

"মাভৈ মাভৈ হের অবতীর্ণ আমি,
করিব গোলকধাম এ ভারত-ভূমি।

শুধু ভারতে নহে;—

গুহ্য-গোলোকের প্রেম বিশ্বে বিলাইব,
কৃৎস্ন বিশ্ব চরাচর গোলোক করিব।
বিতরি রাধিকা-প্রেম নাচাইব সবে,
স্থাবর, জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলে,
পশু, পক্ষী, সুর, নর, কিন্নর, রমণী,
রাধাপ্রেম সঞ্চারিব সবার অন্তরে॥

অপর একস্থানে লিখিয়াছেন—

কর্ম্মীজ্ঞানী বাসভূমি ইউরোপ, রুষ,
জর্ম্মাণি, দেন্মার্ক, ফ্রান্স, আর্ল্যাণ্ড, হলাণ্ড,

জাপান প্রভৃতি দ্বীপ, সর্ব্ব মহাদেশ,
গ্রাম দেশ পল্লী পাড়া নগর সহর,
আমেরিকা ও আফ্রিকা বিশ্বচরাচর,
অচিরে ভাসিবে গৌর প্রেমের বন্যায় ॥”

অহো ! বর্ত্তমানে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আবার আবির্ভূত হইয়া যে হরিনামে, রাধাপ্রেমে বিশ্ব প্লাবিত করিবেন, পরমহংস স্বামীজীর হৃদয়ে তাহা কি অপূর্ব্ব জ্বলন্ত জ্যোতিঃতে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে ! এবার বিশ্বের কৃমিকীট পর্য্যন্তও প্রেমের প্লাবনে ধন্য হইয়া যাইবে ! পরমহংসদেবের এই ত্রিকালজ্ঞ-জ্ঞানসম্ভূত অভ্রান্তবাণী যে অচিরেই সফল হইবে, অচিরেই যে ইউরোপ, রুষ, জর্ম্মাণি প্রভৃতি সর্ব্বদেশ গৌরপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। আজ সর্ব্বসাধারণের অনুভূতিটি সিদ্ধ মহাপুরুষের অভ্রান্ত বাক্যে হৃদয়ে বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে।

নিম্নে আর একটি ভক্তিমতী মাতৃদেবীর অপূর্ব্ব স্বপ্নদর্শন উদ্ধৃত করিলাম, পাঠক মহাশয় দেখিবেন, পবিত্রাত্মা ভক্ত হৃদয়ে গৌরের ভাবী হরিসঙ্কীর্ত্তনময় প্রেমলীলাটি কেমন দিন দিন প্রতিভাত হইয়া উঠিতেছে !!—তিনি লিখিতেছেন,“আত্মীয়গণের মুখে জগৎগুরুর (শ্রীভগবানের) জগতে আশু আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এই সময়ে আমি পীড়াগ্রস্ত হইলাম। আমার মনে যেন মৃত্যুছায়া পড়িল। কিন্তু প্রাণে একটা বড় নিরাশা জাগিল—হায়, আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল না !—

মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলাম না! সেদিন শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব—আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"অষ্টাহ বরষা অন্তে স্নাত শুদ্ধ বসুন্ধরা,
নাহিক জনতারব নিস্পন্দ নীরব ধরা।
শ্রীরামনবমী দিনে, ঊষার উদয়কালে
হেরিনু মোহনমূর্ত্তি, উত্তর গগন ভালে।
কত শত শশধর, জিনিয়া অঙ্গের বিভা,
ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি দক্ষিণ চরণ কিবা!
সেই পাদপদ্ম জ্যোতিঃ প্রেমময় সুশীতল,
জীবিত করিল যেন, এ বিশাল ধরাতল!
সহসা কীর্ত্তন রবে, ভ'রে গেল দিক্ সব;
কত শত যোগী ঋষি, করিতে লাগিলা স্তব;
আনন্দে উঠিল নাচি বিশ্ববাসী জীবগণ,
লুণ্ঠিত হইয়া কেহ প্রণমিল শ্রীচরণ।
"জয় জয় গুরুদেব জয়দেব অবতার,"—
এই রব বিনা, কর্ণে পশিল না কিছু আর।
সে চরণ জ্যোতিঃ-করে মোর হৃদি ভ'রে এল,
'আমি' 'মোর' অভিমান সেই পদে মিশে গেল।
'প্রভাত হয়েছে' বলি, ডাকিল আত্মীয়গণ,
ভেঙ্গে গেল ঘুমঘোর হইলাম সচেতন।
এখনো স্মরণে এলে কাঁপিয়া উঠিছে হৃদি,
পরাণে জাগিছে যেন সে অমূল্য মহানিধি;

আপনি উঠিছে ভে'সে এই মনে দিবা রা'ত—
পাপ গ্লানি নিবারিতে এসেছেন বিশ্বনাথ।"

(শ্রীমতী রাধাদেবী। বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।)

আজ পবিত্র-হৃদয় ভক্তগণের মানসমুকুরে শ্রীভগবানের শুভ আবির্ভাব চিত্রটি এইরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। সকলেই নিজ নিজ হৃদয়-দর্পণে সেই জগতের বন্ধুর আগমনী-চিত্র প্রত্যক্ষ প্রতিফলিত দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া যাইতেছেন। যুগে যুগেই তাঁহার আবির্ভাবের সময় ভক্তগণ এইরূপ নানা প্রকার অনুভূতি লাভ করিয়া জগতের সম্মুখে জলদ-গম্ভীর নাদে শুভ সমাচাব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। গৌরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য আপনার প্রাণে তাঁহার আবির্ভাব জানিয়া বলিয়াছিলেন,—

"শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর।
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লৈয়া।
আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর,
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া ভিতর।
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর,
তবেসে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর।"

অদ্বৈতের এই অনুভূতি যেমন সফল হইয়াছিল, তেমন আজ আমরা এই বর্ত্তমান অনুভূতিও অচিরে কার্য্যে পরিণত দেখিতে পাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আরও দেখুন

ভগবান নারায়ণ, কলিযুগে আপনার অবতীর্ণ হওয়ায় সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছেন, তাহাতেও আমরা তাঁহার বর্ত্তমান আবির্ভাব অভ্রান্ত মনে করিয়া লইতে পারি। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"শম্ভলে বিষ্ণুযশসোগৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্।

* * * * *

পুনঃ কৃত যুগং কৃত্বা ধর্ম্মান্ সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ।
কলি-ব্যালং সংনিরস্য প্রয়াস্যে স্বালয়ং বিভো॥"

কল্কিপুরাণ ১।১।৪—৮।

বিষ্ণু, দেবগণের অগ্রণী ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, হে বিভো! আমি শম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশার গৃহে আবির্ভূত হইব। "যাত যূয়ং ভুবং দেবা" দেবগণ তোমরা অবতীর্ণ হও। আমি পুনরায় সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করতঃ কলিরূপ কালসর্পকে দমন করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিব। আজ যতই কলির প্রকোপ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে, যতই মহাপ্রলয়ের নিষ্পেষণে জগজ্জীব অশান্তির দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেছে ততই হিন্দুগণ কল্কি অবতারের শুভ আবির্ভাব কাল নিকটবর্ত্তী মনে করিতেছেন। এস্থলে গত ১৩২২ সালের কুম্ভমেলার ব্যাপারটি বড়ই অনুকূল ও আশাপ্রদ বলিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। কুম্ভমেলাতে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, অসংখ্য-সাধুসন্ন্যাসীর নিশানে এবার বড় বড় অক্ষরে লিখিত "সত্য যুগ" শব্দটি বাস্তবিক

অপূর্ব্ব আনন্দময় সুখস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া ভগবানের আবির্ভাব ও নবযুগের সূচনা গৌরবের সহিত জগৎবাসীকে জ্ঞাপন করিতেছিল। সর্ব্বত্রই সত্যযুগের শুভসমাচার, সর্ব্বত্রই— সমস্ত সাধুসন্ন্যাসীর মুখেই দৃঢ়তাব্যঞ্জকস্বরে ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে সমালোচনা। অগণিত সাধুসন্ন্যাসীর মুখে অবতার সম্বন্ধে এইরূপ ঘোষণাটিতে সকলেরই প্রাণে নারায়ণের ভবিষ্যদ্বাণীটি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সকলেই নারায়ণের আসন্ন অবতারের প্রতীক্ষাব আশায় বুক বাঁধিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। নারায়ণের ভবিষ্যদ্বাণী যখন নিত্য-সত্য ও অভ্রান্ত, তদুপরি ত্রিকালজ্ঞ সাধুসন্ন্যাসীদিগের অনুভূতিও যখন নিশ্চয় অভ্রান্ত, তখন ভগবৎ বাক্যের সহিত ভক্তানুভূতির একত্র মিলনে যে এবার তাঁহার আবির্ভাবটি স্থির নিশ্চয়ভাবে সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আজ বিশ্ববাসীর অনুভূতিটি যে বিশ্বনাথের আবির্ভাবের সূচনা করিয়া দিতেছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সময়েই মেঘ জল দান করে, সময়েই বৃক্ষে ফুল-ফলের বিকাশ হয়, অসময়ে কোথাও কিছুর বিকাশ হয় না। শুক্লপক্ষ আসিলেই চাঁদের আলোতে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার সহজ ও স্বাভাবিক। কৈ এত দিন ত শ্রীভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে এরূপ চারিদিকে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই? এবার সময় আসিয়াছে! তাই ঊষার অরুণ আভা জগৎবাসীকে দিননাথের শুভাগমন জ্ঞাপন করিতেছে। শুধু হিন্দুদিগের মধ্যেই এই আবির্ভাবের কথা

উঠে নাই, ঐ দেখুন বৌদ্ধগ্রন্থের ত্রিপিটকের 'দীর্ঘনিকায়' বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক কি উক্ত হইয়াছে—

Now when the term of human life is eighty years, He who is named Metteyya, the Blessed one, shall arise in the world, that saint, that fully enlightened one, who knoweth all and leads the righteous life. Auspicious He, world-knower He, incomparable Charioteer of men who would be tamed, Teacher of gods and men, the Buddha, Blessed Lord ; just as now I have myself arisen in the world, that saint, that fully enlightened one , * * *

He shall proclaim the Teaching pleasant in its beginning, pleasant in its middle and pleasant in the end thereof, and shall make known its spirit and its letter, in its perfection and in all its purity. He shall proclaim the holy life, just as I myself have done and do. He shall gather round Him a following of monks that number many thousands just as I have gathered round me a following of monks of many hundreds."

Dirgha Nikaya, p. 75, para. 25, Pali Text Society's Edition, Vol. 3.

যখন মানুষের আয়ুস্কাল মাত্র অশীতি বৎসর হইবে, তখন ভগবান মৈত্রেয় জগতে আবির্ভূত হইবেন। সম্প্রতি আমি যেমন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছি, সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত

মৈত্রেয় সেইরূপ আবির্ভূত হইবেন। তিনি সম্পূর্ণ ও সুপবিত্র শিক্ষার প্রচার করিবেন। আমার চতুর্দ্দিকে যেমন শত শত শ্রমণ সমবেত হইয়াছে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেইরূপ সহস্র সহস্র শ্রমণ সমবেত হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রাণের সহজ অনুভূতির সহিত আজ বুদ্ধদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া তাঁহার বর্ত্তমান আবির্ভাবটি জলদগম্ভীরনাদে অভ্রান্তভাবে জগতে ঘোষণা করিয়া দিতেছে। বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী কি ঘুণাক্ষরেও মিথ্যা হইতে পারে? তাঁহার নিত্য-সত্য ভবিষ্যদ্বাণী আজ অভ্রান্তরূপে জগৎবাসীকে আবির্ভাবটি জানাইতেছে! বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণ আজ ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে বুদ্ধের আবির্ভাবের পথ চাহিয়া সোৎসুকচিত্তে প্রতি মুহূর্ত্ত এক এক করিয়া গণিতেছেন! সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে এক নিষ্ঠাবান্ ভিক্ষু শ্রীমৎ মাগিয়াই টিকা বোধিসত্ব মৈত্রেয়দেবের আশু আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বহু সহস্র শ্রমণ ও শ্রাবক লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মদেশের মিথিলা প্রদেশে তিনি চতুর্দ্দশটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া সপারিষদে ভগবানের 'আসা'-পথ চাহিয়া আছেন। তথায় ৯০ জন পুঙ্গি এবং সাত শত শিষ্য তাঁহার অনুভূতি ও ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিয়া অবিরত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া করপুটে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা শীঘ্রই পঞ্চম বুদ্ধের আবির্ভাবের আশা করিতেছেন। যুগে যুগে ভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপ পূর্ব্বসূচনা বিঘোষিত হইয়া থাকে। বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে মায়াদেবী অপূর্ব্ব স্বপ্নে তাঁহার আবির্ভাব

জানিয়াছিলেন। এখনও অসংখ্য অসংখ্য বৌদ্ধ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তাঁহার আবির্ভাব নানাভাবে অভ্রান্তরূপে অবগত হইতেছেন। পূর্ব্বের মায়াদেবীর অনুভূতি যখন সময়ে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান অসংখ্য মহাপুরুষের অনুভূতি ও বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত না হইবে কেন?

হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের ন্যায়, আজ খৃষ্টভক্তগণও ভগবানের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছেন। এই দেখুন তৎসম্বন্ধে খৃষ্টগ্রন্থ সুসমাচারে Gospel (New Testament) যীশুর শ্রীমুখের বাক্য রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন:—

And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near. Go ye not therefore after them. But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. Then said he unto them, Nation shall rise against Nation, and Kingdom against Kingdom: and great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.—Luke XXI. 5—28.

And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judæa

flee to the mountains ; and let them which are in the midst of it depart out ; and let not them that are in the countries enter there into. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days ! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations : and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars ; and upon the earth distress of nations, with perplexity ; the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads ; for your redemption draweth nigh.—Luke XXI.

"সাবধান ! তোমরা যেন প্রবঞ্চিত হইও না ; কারণ অনেকে আমার নামে আসিবে, এবং বলিবে—'আমি খৃষ্ট'। তোমরা যেন তাহাদের অনুগমন করিও না। জাতির সহিত

জাতির, রাজ্যের সহিত রাজ্যের তুমুল সংগ্রাম বাধিবে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পৃথিবী উৎখাত হইবে; দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লোককে উৎসন্ন করিবে। ভূতলে ও আকাশে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা উৎপন্ন হইবে; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারকায় উৎপাত দৃষ্ট হইবে; সমুদ্রে ভীষণ প্লাবন উত্থিত হইবে; জনগণ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইবে; সেই সময় জানিও—আমি আবার আসিব—প্রভাবে ও মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আসিব।"

আজ জগৎময় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়া যীশুর পুনরাগমনের সময়টি,—ভবিষ্যদ্বাণীটি খৃষ্টভক্তদিগের প্রাণে অভ্রান্ত আশার আলো প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছে। খৃষ্টসম্প্রদায় আজ ভগবৎ আবির্ভাবের প্রাণের সহজ অনুভূতি, যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রাণে দৃঢ়ীভূত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা আজ যীশুর আগমনের প্রতীক্ষায় পুষ্পমাল্য হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অবিরত শান্তিময়ের আবির্ভাবের নিমিত্ত করুণ আহ্বানে—অশান্তিময় জগতে শান্তিবারি-বিন্দু দান করিতে তৃষিত চাতকের মত ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিয়াছে! এমন কি শুনিতে পাইতেছি—তিনি আবির্ভূত হইয়া যে অবস্থান করিবেন, তজ্জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয়ে মন্দির পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে! যাঁহারা অভ্রান্তরূপে তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারেন, তাঁহাদের প্রাণে এরূপ বিশ্বাস সহজ ও স্বাভাবিক। ভক্তগণের নিকট ভগবান চিরদিনই প্রকাশিত। ভক্তগণ

চিরদিন তাঁহাকে জানিতে, বুঝিতে ও ধরিতে পারেন। তাই চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে,—

"পলাইতে তুমি প্রভু হও বড় বীর।
ভক্তগণে তোমা ধরি করয়ে বাহির।"

ভক্তের নিকট ভগবান কখনও গোপন থাকিতে পারেন না, তাঁহারা ভক্তিবলে পবিত্র হৃদয়-দর্পণে সর্ব্বদাই তাঁহাকে জানিতে পারেন। সেইজন্যই আজ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তগণ অভ্রান্তভাবে তাঁহার আবির্ভাব জানিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া পথপানে চাহিয়া পল কে প্রলয়ের মত কাটাইতেছেন। আজ ইংলণ্ড, ইতালি, সুইডেন, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বহুদেশে যীশুর আগমন সম্বন্ধে নানা প্রকার গ্রন্থ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া, সমস্ত জগৎকে মহাপ্রভুর মহাপূজার জন্য প্রস্তুত হইতে মঙ্গলময় আহ্বানে জাগরিত করিতেছে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ পাশ্চাত্য জগতের শুষ্কজ্ঞানী কঠোর বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে পর্য্যন্ত, ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে অনুভূতি অভ্রান্তভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে! মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী সভাপতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার অলিভার লজ সাহেব মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, "তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে আশার আলো ইতিমধ্যেই আকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাট্যকার ও ভাবুকেরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, জনসাধারণ জাগ্রত হইতেছে এখনই দিব্যদ্রষ্টা কবিগণ পরমাত্মার পুনরাবির্ভাবের বা পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় তাঁহার আবাহনগাথা রচনা করিতেছেন,—অচিরে আমরা কবির

স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত দেখিব যে, যীশুখৃষ্ট যুডিয়ার স্রোতে নয়, টেমসের জলে বিচরণ করিবেন।" ইনি আরও বলেন,—"যদি কেহ মনে করেন এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী অসম্ভব, যদি মনে করেন, —অবতারের মত একটি প্রধান ঘটনা পূর্ব্ব হইতে সূচিত ও বিজ্ঞাপিত হইতে পারে না, তবে তিনি ভ্রান্ত। কারণ লজ সাহেব বলিতেছেন, আমার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। অবতার নহে,—দৈবশিশুও নহে; কিন্তু একটি বিচিত্র নিয়তিপূর্ণ মানবশিশুর ভাবী জন্ম ঐ ভাবে পূর্ব্ব হইতেই সূচিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এ সূচনা কালে সত্যে পরিণত হইয়াছে,—দেখিয়াছি। এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করেন ও বলেন, স্থূলজগতে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহার সূচনা ও সংযোজনা প্রথমতঃ সূক্ষ্মজগতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" আমরাও লজ সাহেবের এই সত্যের অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, যাবতীয় স্থূল ব্যাপার সূক্ষ্মেরই বিকাশমাত্র। সূক্ষ্ম নিত্য; এখন যাহা স্থূলে আছে, পূর্ব্বে তাহা সূক্ষ্মে ছিল, এবং পরেও থাকিবে। সূক্ষ্ম,— সূক্ষ্ম-দর্শনের গোচরীভূত; তাই স্থূলদর্শীগণ উহার অস্তিত্ব অনুভূতি করিতে পারেন না। আজ যে স্থূলজগতে ভগবানের আবির্ভাবের ঘোষণা; ইহাও সূক্ষ্মজগতের তরঙ্গাঘাত বা বিকাশমাত্র। যাহা হউক বড়ই আনন্দের বিষয় যে, আজ জড়বৈজ্ঞানিকগণ পর্য্যন্তও কার্য্যকারণসূত্র ধরিয়া অভ্রান্তরূপে ভগবানের আবির্ভাব জগতের নিকট ঘোষণা করিতেছেন। আবার দেখুন রুস দেশের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কাউণ্ট টলষ্টয়

মৃত্যুর পূর্ব্বে কি ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া গিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন —"পূর্ব্ব দেশ হইতে একজন মহাপুরুষ ইয়ুরোপে যুদ্ধাবসানে আসিয়া শান্তি ও প্রেম-প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেই মহা-প্রেমাবতারের মহাপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জগতে অপূর্ব্ব প্রেম-প্রবাহ বহিবে। বক্ষে ও বাহুতে চির বিরহীর আকুলতা লইয়া বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে। এবার বিশ্ব জুড়িয়া বিশ্বদেবতার বসন্তোৎসব হইবে। অনেক অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার মানবের নিকট উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। অতীতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ দান নবীনের হস্তে উপহার দিয়া প্রাচীন-জগৎ কালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে।" এরূপ অনুভূতি আজ নূতন নহে। খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও জন নামক এক মহাপুরুষ ঘোষণা করিতেন,—"আমার পর এমন কোন মহাপুরুষ আসিতেছেন, যাঁহার পদরেণুরও আমি যোগ্য নহি। আমি খৃষ্ট নহি আমি তাঁহার পূর্ব্বসূচী—তাঁহার ঘোষক মাত্র। জনের এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন সময়ে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমানে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অনুভূতিমূলক ঘোষণা বর্ণে বর্ণে সফল না হইবে কেন? যীশুর নিত্যসত্য অভ্রান্ত বাণী ও ভক্তবৃন্দের অনুভূতি কি মিথ্যা হইতে পারে? কখনই নয়। নিশ্চয় ভক্তগণ অচিরে যীশুর আবির্ভাব দেখিয়া জীবন ধন্য করিয়া লইবেন।

মুসলমান সম্প্রদায় বলিতেছেন,—

"মহম্মদের পর ইমাম মেহেদী নামক আর একজন অবতার আসিবাব কথা আছে।" তাঁহারা আশা করেন, শীঘ্রই তাঁহার

আবির্ভাব হইবে। কেননা, যেরূপ সময়ে তাঁহার আবির্ভাবের কথা আছে, যুদ্ধবিগ্রহ মহামারি ও নানা প্রকার দুরবস্থায় ঠিক সেই সময়টি সম্পূর্ণরূপে সূচিত হইতেছে। সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত আছে যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে একজন বিশিষ্ট আচার্য্য আবির্ভূত হইবেন। সম্প্রতি মৌলানা হাসান নিজামি নামক দিল্লীর একজন পরিব্রাজক মিসর, আরব ও পারস্যের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন এবং হজরত ইমাম মেহেদির আবির্ভাব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইমাম মেহেদির আবির্ভাব সম্বন্ধে যে মুসলমান সমাজে বিশেষ আশা জাগরুক হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। মহম্মদের ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত মুসলমান ভক্তগণের প্রাণের অনুভূতি মিলিত হইয়া আজ ইমাম মেহেদীর আবির্ভাবটি অভ্রান্তরূপে জানাইয়া দিতেছে। আমরা আশা করি, মুসলমান ভক্তগণ সত্বরই তাঁহাদের হজরতের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

আজ পারস্যবাসীরা তাঁহাদের পরিত্রাতা Saoshyantএর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এবং ইহুদীরা তাঁহাদিগের Messiahএর প্রতীক্ষা করিতেছেন। সকলেই ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব সূচনা ঘোষণা করিতেছেন।

আজ সমস্ত দেশ ও সমস্ত সম্প্রদায় হইতেই—শ্রীভগবানের আসন্ন অবতার সম্বন্ধে মঙ্গলময়-রোলে বিশ্ব নিনাদিত হইতেছে! কি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, কি নানকপন্থী সন্ন্যাসী, কি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, কি শ্রী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সকলের মুখেই

একই কথা। অনেকে আবার অনেক ভাষায় গ্রন্থ পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া জানাইতেছেন,—"শীঘ্রই এমন কেহ আসিবেন—যাঁহার আগমনে পৃথিবী হরিনামময় হইয়া যাইবে।"

অবতারের পূর্ব্ব সূচীস্বরূপ যে সমস্ত মহাপুরুষের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজর্ষি-প্রতিম শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কথাটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইনি নানা ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আজ অভ্রান্তরূপে জগৎগুরুর আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা নামক মাসিক পত্রিকা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই হীরেন্দ্র বাবুর প্রাণের এই গভীর গবেষণাপূর্ণ নিত্যসত্য ও অভ্রান্ত তত্ত্বসমূহ পাঠে পরম-প্রীতি ও বিশ্বাসভক্তি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভ্রাতৃগণ! এই যে আজ নানা সম্প্রদায় হইতে জগৎময় ভগবানের আবির্ভাবের মহারোল উঠিয়াছে;—এই যে, যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্তভাবে স্পষ্টাক্ষরে ভগবানের আবির্ভাব জ্ঞাপন করিতেছে,—ঐ যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বিষ্ণু, বুদ্ধ ও যীশুর নিজ নিজ ভবিষ্যদ্বাণীতে পুনরাবির্ভাবের মঙ্গলময় সমাচার জগৎ-ময় ঘোষণা করিতেছে, আপনারা কি ইহা অবিশ্বাস করিতে চান? শাস্ত্রের প্রমাণ, শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাক্য, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়স্থ তত্ত্বদর্শী-ভক্তগণের প্রাণের অভ্রান্ত অনুভূতি,—ইহা কি আপনি অবিশ্বাসের অন্ধতায় অন্ধকারে ডুবাইয়া দিতে চান? আসুন! অবিশ্বাসের মোহ-কালিমা মুছিয়া, সঙ্কীর্ণ জ্ঞানাভিমানের অন্ধ-বিশ্বাস ঘুচাইয়া সরল

বিশ্বাসের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন; আপনিও নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে শ্রীভগবানের আবির্ভাবসূচক বিমল জ্যোতিঃমণ্ডিত অপার্থিব অনুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যাইবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের আবির্ভাব সময়ে যেমন অনেক মহাপুরুষ জানিয়া শুনিয়া মঙ্গলময় পূর্ব্বসূচনা ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমানেও অসংখ্য কণ্ঠে তাঁহার আবির্ভাব ঘোষিত হইতেছে আপনিও সেইরূপ জানিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া, প্রেমময়ের প্রেমের প্লাবনে বিভোর হইয়া যাইবেন। তাঁহার সাক্ষাৎদর্শনে ও সেবায় জীবন ধন্য করিয়া লইবেন।

ধন্য মানব! আজ তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। আজ, এই নশ্বর দেহেই, মর-জগতেই শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া চিরতাপ-দগ্ধ পাপ-প্রাণ সুশীতল করিবে। আজ সমস্ত অবতারের ভবিষ্যদ্বাণী,—সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রাণের অনুভূতি অচিরেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। পাঠক মহাশয়কে আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি,—পূর্ব্বে যখনই যে জাতির বা যে সম্প্রদায়ের ভিতরে ভগবানের আবির্ভাবের ঘোষণা হইয়াছে, তখনই তথায় অচিরে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া পূর্ব্বসূচনা বাস্তবে পরিণত করিয়া দিয়াছে। এবার যখন জগৎময় সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতরেই তাঁহার আবির্ভাবের রোল উঠিয়াছে, তখন সমস্তের বাসনা ও প্রার্থনাই যে অচিরে সফল হইবে; সমস্তের প্রাণের সাধ মিটাইবার জন্যই যে, সর্ব্বশক্তি একাধারে লইয়া, সর্ব্ব অবতার সমষ্টিতে ও পূর্ণ লীলারসে পূর্ণতম হইয়া, মহাবতারী জগতের বন্ধুটি যে জগতের

উদ্ধারণে আবির্ভূত হইতেছেন, তাহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। কেন না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের পূর্ব্বসূচীর ন্যায়, আজ সমস্ত জগৎবাসীর প্রাণের সহজ অনুভূতি ও আবির্ভাব-ঘোষণাই তাহার অকাট্য-প্রমাণ। সময়ে সবই হয়, সময় হইলেই, কি জড়ে, কি চেতনে, কি উদ্ভিদে, নব নব ভাব, নব নব রস আপনা হইতেই স্ফুরিত হইয়া উঠে। অবতার আসিবার সময়েই তাঁহার আবির্ভাবের ভাব ও সূচনা জগতে ঘোষিত হয়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু শত সহস্র বৎসর যাবৎ লীলা হইতে নিত্যে চলিয়া গিয়াছেন, এতদিন ত কোন সম্প্রদায় তাঁহাদের কাহারও আবির্ভাবের কথা স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নাই!! আজ কেন এমন হইল, কেন সমস্ত জগতে, সমস্ত জগৎবাসীর প্রাণে তাঁহার আবির্ভাবের শুভ মঙ্গলগীতি জাগিয়া উঠিয়াছে; কেন আজ সকলে সমস্বরে তাঁহার শুভ আবাহন সঙ্গীত গান করিতেছে? কেন করিতেছে, কেন বলিতেছে—সময় আসিয়াছে, তাই সাময়িক ভাবের তরঙ্গে জগৎ ভরিয়া গিয়াছে, পবিত্র হৃদয়-দর্পণ গুলিতে তাঁহার ভাবরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া উঠিতেছে। আজ সূক্ষ্মের তরঙ্গ, স্থূল জগতের ভিতরে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, জগৎবাসী তাই ভগবানের আবির্ভাব বার্ত্তা আপনা আপনি সেই অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় জগৎময় ঘোষণা করিতেছে। এই শুভ সার্ব্বজনীন মঙ্গলগীতিতে আঘাত করিয়া সকলের অনুভূতি ও প্রাণের আশাতে আঘাত করিয়া কেহ যদি নিজের অনুভূতিটিই প্রধান প্রতিপন্ন করিয়া বলিতে চান,—জগতে প্রচার করিতে চান, এবার শুধু মৈত্রেয় বুদ্ধ, শুধু যীশু

বা শুধু বিষ্ণু আসিতেছেন, তবে তাঁহার সে সঙ্কুচিত ভাবটি আমরা সমর্থন করিতে পারিব না। বরং তাঁহার কথায় আমরা প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিব, এবার সমস্ত সম্প্রদায়ের অনুভূতির দিনে সর্ব্বশক্তি একাধারে, সমস্ত লীলা-রসময় ভগবানের আবির্ভাব (মহাপ্রকাশ) অনতিদূরে। আজ যিনি আসিতেছেন,—তাঁহার একধারেই গৌর, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির সর্ব্বসমষ্টি। আজ মানবমাত্রই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া, আপন আপন টি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইবে। ভাব অনুসারে হিন্দু তাঁহাতে গৌর, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে, বৌদ্ধ বুদ্ধকে, খৃষ্টান যীশুকে এবং মুসলমান মহম্মদকে বুঝিয়া পাইয়া সুখের তরঙ্গে ভাসিবে। আজ শুধু তোমার ভাব অনুসারে তোমারটি বুঝিয়া পাইবে, আর অন্যের অনুভূতি মাঠে মারা যাইবে, অন্যের ভাবটি বিফলে যাইবে কেহ মনে করিও না। একই ভাব তরঙ্গের আংশিক সত্য, আর আংশিক মিথ্যা কেহ মনে স্থান দিও না। যেমন জগৎময় তরঙ্গ, তেমন জগতের মহা-উদ্ধারণের জন্য জগতের বন্ধুটির আবির্ভাব। বিপদে বন্ধুর প্রয়োজন। বিপদের সময় গুরুর উপদেশ প্রাণে পৌঁছায় না। তাই আজ জগতের বিপদের দিনে জগতের বন্ধুটি পূর্ণপ্রেম, আনন্দ ও শান্তি দান করিতে আসিতেছেন। এবার শুধু হিন্দুর জন্য বা শুধু মুসলমানের জন্য সাম্প্রদায়িক ভগবান আসিবেন না। এবার আসিতেছেন;— জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানবের বন্ধু, দানবের বন্ধু, কীট কীটাণুর বন্ধু, স্থাবর জঙ্গমের বন্ধু—জগতের বন্ধু—জগদ্বন্ধু।

এ পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধারণ অনুভূতির কথা বলিয়াছি, এবার সাধারণ অনুভূতি ছাড়িয়া বিশেষ অনুভূতি উল্লেখ করিয়া দেখাইব.—রাম না জন্মিতেই যেমন বাল্মীকি নাম, ধাম ও ভাবীলীলা কাহিনী জানিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, আবার গর্গমুনি যেমন নন্দ-সূতকে গোলোকবিহারী জানিয়া কৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।"

নিত্যানন্দ যেমন গৌরাঙ্গ সুন্দরের আবির্ভাব জানিতে পারিয়াছিলেন,—

"যে দিন জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥"

মায়া দেবী যেমন বুদ্ধের জন্মিবার পূর্ব্বেই স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন,—

অথ বোধিসত্তো সেতবর বারণোহুত্বা * * * মাতুসয়নং তিক্‌খত্তুং পদক্‌খিণংকত্বা দক্‌খিণং পস্‌সং ফালেত্বা, কুচ্ছিং পবিট্‌ঠো সদিসো অহোসি।"

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত চৌষট্টি জন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনিয়া জানাইলে তাঁহারা বলিলেন,—

"মা চিন্তয়সি মহারাজ! * * * পুত্তোতে ভবিস্‌সতি। * * * সচে অগারা নিক্কম্ম সব্বজিস্‌সতি বুদ্ধো ভবিস্‌সতি।

জন নামক একজন মহাপুরুষ যেমন নাম নির্দ্দেশ করিয়া যীশুর আবির্ভাব ঘোষণা করিতেন, বলিতেন আমি যীশুর

পূর্ব্বসূচী মাত্র ; সেইরূপ আজ বিশেষ নির্দ্দেশকারী প্রত্যক্ষদর্শী বাল্মীকির মত, গর্গমুনির মত, নিত্যানন্দের মত ময়াদেবীর মত ও জনের মত প্রত্যক্ষভাবে নাম ধাম নির্দ্দেশ করিয়া বর্ত্তমান অবতারকে যাঁহারা জানিয়াছেন ; শ্রীভগবান কৃপা করিয়া যে সমস্ত ভাগ্যবানকে ধরা দিয়া, আপনার মহাউদ্ধারণ-লীলার বিষয় বিশেষভাবে জানাইয়াছেন ; আমরা এখন নাম ধাম সহ সেই সব প্রত্যক্ষ অনুভূতির অপূর্ব্ব কাহিনী উল্লেখ করিয়া জগৎগুরু জগতের বন্ধুকে জগৎবাসীর গোচরীভূত করিতে চেষ্টা করিব।

অবতারের প্রথম-প্রকাশ—সমাধিতে।

প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা,—হুগলীতে প্রাতঃস্মরণীয় পরম-ভাগবত অন্নদাচরণ দত্ত নামক জনৈক মহাপুরুষ গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অন্নদা বাবু গৃহী হইলেও সাধুতায় ত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের পূজার পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায়ই প্রেমভক্তিতে ডগমগ হইয়া বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন। তাঁহার পবিত্র আধারে গৌরের আবেশ হইত ! সমাধি অবস্থায় তাঁহার মুখে গৌর নানা অপূর্ব্ব তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতেন। অন্নদা বাবুকে দর্শন করিবার জন্য, তাঁহার প্রেমময় পবিত্র অঙ্গস্পর্শে ধন্য হইবার জন্য এবং আবিষ্ট অবস্থায় তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদা বহু সাধুসজ্জনের সমাগম হইত। অন্নদা বাবু নামমাত্র গৃহী ছিলেন, আফিসে যাইতেন কিন্তু আফিসের কার্য্য কিরূপে করিতেন, সকলে ভাবিয়া

আশ্চর্য্যান্বিত হইত। আমরা তাঁহাকে দর্শন করি নাই, তবে তাঁহার নিকট যাহারা যাইতেন, সেরূপ কয়েকটি মহাপুরুষ এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াই আমার এই বৃত্তান্ত লেখা। ইঁহারা প্রত্যেকেই ত্যাগী-ভক্ত ও সিদ্ধমহাপুরুষ। সেইজন্য ইঁহাদের কথাগুলিও প্রত্যক্ষ শ্রবণের ন্যায় অভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহাদের একজনের নাম জয়নিতাই।* দ্বিতীয়ের নাম শ্যামানন্দ দাস।† ইঁহারা পরম প্রেমিকভক্ত, সেইজন্য ভক্তচূড়ামণি অন্নদা বাবুর তথায় গিয়াছিলেন।

এক দিন অন্নদা বাবু আবেশে কলিকাতার কোন একটি স্থান ও বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া, একজন লোকের আকৃতি বর্ণন করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাইয়া এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত যাঁহাকে দেখিবে, খুব যত্ন করিয়া লইয়া আসিবে।" কয়েকটি ভক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া কথিতমত এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নাম 'প্রেমানন্দ ভারতী'।

ভারতী মহাশয়কে আজকাল সকলেই জানেন। তিনি সময়ে

* জয়নিতাইর আসল নাম, শ্রীযুক্তদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ইনি পূর্ব্বে এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, এখন প্রায়ই নবদ্বীপে বাস করেন। দিবানিশি হরিনামে বিহ্বলতা ভিন্ন ইঁহার আর অন্য কথা বা অন্য কার্য্য নাই।

† ইঁহার আসল নাম ক্ষেত্রমোহন বসু। ইনিও সংসারত্যাগী। পূর্ব্বনিবাস রাঘবদাঁড়ী,যশোহর। শ্যামানন্দবাবাজীর মত প্রেমভক্তিতে বিহ্বল সর্ব্বদা হরিনামে তন্ময় লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি অন্নদা বাবুর দেহ রক্ষার অব্যবহিত পরেই তথায় গিয়া পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন। ভারতী মহাশয় ইঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনিই শ্যামের প্রেমানন্দে বিহ্বল দেখিয়া ইঁহার নাম রাখিলেন শ্যামানন্দ।

আমেরিকায় যাইয়া পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া আপনার অসাধারণত্বে জগৎপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। ভারতী মহাশয় সাধারণ মহাপুরুষ নহেন। হুগলীতে একজন উচ্চ অধিকারী-ভক্ত সমাধি অবস্থায় তাঁহাকে সুবলের অবতার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভক্তগণ অন্নদাবাবুর আবেশবাণীর কথার এইরূপ সফলতা দেখিয়া, ভারতী মহাশয়কে বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে কলিকাতা হইতে অন্নদা বাবুর নিকটে লইয়া গেলেন! প্রেমিকে প্রেমিকে প্রেমালিঙ্গন হইল! উভয়েই উভয়ের ভাবে মুগ্ধ হইলেন! অন্নদা বাবু ভারতী মহাশয়কে ছাড়িলেন না। অতি যত্নে নিজ বাড়ীতে রাখিয়া আনন্দোৎসবে কাটাইতে লাগিলেন! তিনি ভারতী মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি দয়া করিয়া যাবজ্জীবন এইখানেই থাকিবেন। অন্নদা বাবুর অনুরোধ অনুসারে ভারতী মহাশয় তাঁহার দেহরক্ষার পর পর্য্যন্তও তথায় কিছুকাল ছিলেন।

একদা অপরাহ্নে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে;—অন্নদা বাবুতে গৌরের আবেশ হইয়াছে; আবিষ্ট অবস্থায় হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, নানা তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতেছেন। ভক্তবৃন্দ চারিদিকে বসিয়া আনন্দে শ্রবণ করিতেছেন। এবার অন্নদা বাবুর মুখখানি অতি প্রসন্ন হইল, অপ্রাকৃতভাবে ও ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন, আগামী কা'ল (ষ্টীমার ষ্টেশনের নাম ও সময় উল্লেখ করিয়া বলিলেন) ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ষ্টীমারে তাঁহার দর্শন পাইবে।" অন্নদা

বাবুর আবেশের কথা যে অভ্রান্ত তাহা সকলেই জানেন। তাই তাহারা মহাপ্রভুর দর্শন বাসনায় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। অন্নদা বাবুর ভ্রাতা বরদা বাবু স্থানান্তরে ছিলেন, প্রভুর দর্শনার্থে তাঁহাকে আসিবার জন্য তারে সংবাদ দেওয়া হইল। পরদিন সকলে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে ষ্টীমার আসিবার পূর্ব্বেই হুগলীর অনতিদূরে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জাহাজ আসিল, আজ বহুকাল পরে শ্যামের বাঁশী স্বরে যেন মনপ্রাণ বিহ্বল করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! অমনি সকলে আবেগভরে উন্মত্তের মত ছুটিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সকলেই মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, অন্নদা বাবু অতি ধীরভাবে সকলকে বলিলেন, তোমরা কেহ স্পর্শ করিও না—বিরক্ত করিও না, দূর হইতে প্রণাম কর,—দর্শন কর। ঐ দেখ অনিন্দ্য সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় কিশোরমূর্ত্তি, আপনি আপনভাবে গঙ্গার জলে স্থির দৃষ্টি যোজনা করিয়া, চিত্রপটের অঙ্কিত চিত্রের মত, স্বপনের স্বর্গীয় ছবির মত, স্থির অবিচলভাবে ঐ অনিমেষ লোচনে বসিয়া আছেন! আহা মরি মরি কি রূপ! কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! জগতে এমনটি ত দ্বিতীয় নাই!! এমন রূপ, এমন অপ্রাকৃত ভাব, এমন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় কান্তি কি মানবে সম্ভবে! সকলে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়াছেন! জাহাজ ছাড়িয়া নবদ্বীপ পানে চলিল, সকলে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে সেই অপার্থিবরূপ রাশি দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া নবদ্বীপে পৌঁছিলেন। সকলে এমন স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, তথাপি

কেমন কি হইল, অকস্মাৎ তিনি সকলের দৃষ্টির অতীত হইয়া কোথায় কি ভাবে কোন্‌পথে চলিয়া গেলেন, কেহ জানিল না! পরে ক্ষিপ্তের মত নবদ্বীপের নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া সন্ধান পাইলেন। তাঁহারা আবার দর্শন পাইলেন, প্রসাদ পাইলেন, এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে জগদ্বন্ধুনামে শ্রীভগবানের বর্ত্তমান অবতারের কথা, আবেশে প্রভুর ভাবী দর্শনের কথা জানাইতে লাগিলেন। অন্নদা বাবু প্রভুর দর্শন পাইবার পরই ভক্তগণ ও আত্মীয় স্বজনকে একদিন বলিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, প্রভুর মহাপ্রকাশের বহু বিলম্ব আছে। এই দেহে অনেক কাম-কামনা সম্ভোগ হইয়াছে, জরাজীর্ণ এদেহে আর তাঁহার মহালীলার কোন কার্য্যসম্পন্ন হইবে না। তোমরা দুঃখ করিও না, আমি এদেহ পরিবর্ত্তন করিয়া অতি সত্বরেই আসিতেছি। সত্বরই তাঁহার কার্য্যের উপযোগী হইয়া আসিতেছি। সকলে তাঁহার কথাতে মর্ম্মাহত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্নদা বাবু অবিলম্বে ধীর শান্ত ভাবে, হরিনাম করিতে করিতে সকলের কাছে হাসিমুখে বিদায় লইয়া দেহ-রক্ষা করিলেন। অন্নদা বাবুর দেহ-রক্ষার সময় ভারতী মহাশয়কে আপনার প্রতিনিধিরূপে ভক্তগণের হাতে অর্পণ করিয়া গেলেন। ভারতী মহাশয় তখন ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর অবতারবাদ, অন্নদা বাবুর আবেশের কথাটি প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়া বিশেষ ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনের জন্য কয়েকটি ভক্ত পাগলের মত হইয়া উঠিলেন।

ভারতীমহাশয়, ক্ষেত্রনাথ বসু ও অন্যান্য কয়েকটি ভক্তসহ, সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ কান্দা গ্রামে প্রভুর তাৎকালিক-ধামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া শুনিলেন, প্রভু পাবনা গিয়াছেন। অমনি সকলে মিলিয়া ব্যাকুল ভাবে পাবনা যাইয়া তিন চারি দিন থাকিবার পর প্রভুর অপূর্ব্ব দর্শন পাইলেন। প্রভু তখনও প্রায়ই আবরণে থাকিতেন। সমস্ত দিন ঘরে দরজা বন্ধ থাকিত, রাত্রিতে সময় সময় বাহির হইতেন। কখন কখন দিনেও শরীর আবৃত করিয়া বিশেষকার্য্যবশতঃ বাহির হইতেন। এই সময় হইতে ভারতী মহাশয়, সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। তখন তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব ঘোষণা শুনিয়া অনেকে আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হন। এই সময় পরমভক্ত স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ (অমির নিমাই চরিত লেখক) মহাশয় ভারতী মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর অবতার সম্বন্ধীয় অলৌকিক তত্ত্ব অবগত হন। শিশির বাবু সানন্দচিত্তে ভারতী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে ভগবানের অবতার বলিয়া আবগারী নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন একজন ভক্তকে বলেন,—"তুই ভারতী ও শিশিরকে নিষেধ করিস্, যেন আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার না করে। উহারা আমাকে ভগবান বলিয়া প্রচার করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক বিশ্বাস করে না। আমার ভগবত্তায় যদি দৃঢ়বিশ্বাসই থা'কত, তবে, ইহা ও

বিশ্বাস থা'কত,—ভগবানকে অন্যের প্রচার করিবার দরকার হয় না। সময় হইলে তিনি জগতে আপনিই প্রকাশ হইবেন। বাতির আলোতে সূর্য্য দে'খ্‌তে হয় না; সূর্য্য স্বপ্রকাশ।"

প্রভু জগদ্বন্ধুর এই কয়েকটি কথা'তেই তাঁহার পূর্ণ ভগবত্তা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রভু নিত্য-মাধুর্য্যময়, তিনি মায়িক জগতের সাধুসন্ন্যাসীর মত প্রতিষ্ঠা চাহেন না। তাঁহার কোন বেশ নাই, মন্ত্র তন্ত্র নাই, জটা নাই, চিম্‌টা নাই, বর্ক্তৃতা নাই, নীরবে আপনি আপন ভাবে, অসূর্য্যম্পশ্য হইয়া ক্ষুদ্র কুটীরে থাকিয়া ক্রমে আত্মশক্তি-সঞ্চারে সমস্ত জগৎকে আপনার প্রেমের ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন। সূর্য্যকে বাতির আলো দিয়া দেখতে হয় না, সময় আসিয়াছে—ক্রমেই তাঁহার মহা-প্রকাশের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ক্রমেই জ্যোতিঃ বিকাশ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, অচিরেই জগৎবাসী, স্বপ্রকাশ অনন্ত-জ্যোতিঃতে চক্ষু মেলিয়া শ্রীভগবানের স্বরূপ দর্শনে ধন্য হইবে। সত্বরই প্রভুর শ্রীমুখের বাক্যের সার্থকতা দেখিবে। এই সময়ে ভারতী মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দরের নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানাতে ভারতী মহাশয়ের ঠিক সুবলের ভাবই প্রকাশ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

প্রাণ কানাইয়া সেত তুইরে!
তবে মিলন-বঞ্চিত কাহে মুইরে!
তুই গোলোক অবতার,
নীচনরক মুই ছার,

তবু তোরে প্রেমে কেন আলিঙ্গিতে চাইরে ?

দেখা নাই কথা নাই
কোন ত সম্পর্ক নাই
তবু ভাবি, আমি বড় তুই ছোট ভাইরে ?
কোন কি জনমে মোর
বড় ভাই ছিনু তোর
স্নেহে হৃদে প্রেমসিন্ধু উথলে কি তাইরে ?
কোন্ পাপে বল তবে,
জনমিনু পুন ভবে,
হেন পাপাচারী হয়ে কাতরে সুধাইরে ?
বল্ বল্ প্রাণ কানাইরে !
প্রাণেত জেনেছি তুই প্রাণ কানাইরে,—
ব্রজের সে কালাচাঁদ
নদীয়ার গোরাচাঁদ
সংশয়ত নাহি ইথে সংশয়ত নাইরে,—
ছিনু আমি তোর সাথে
সংশয় নাহিক তাতে
তোর প্রিয় কোনরূপে স্মরণ ত নাইরে !
হ'য়ে হেন অধিকারী
এবে হেন পাপাচারী
কেন হ'নু বল্ কানু ভাবিয়া না পাইরে ?

* * *

আর নাহি সরে কথা
আর নাহি সহে ব্যথা
পতিতে উদ্ধার কর তোরই দোহাইরে—
বুকে আয় প্রাণ কানাইরে !
(প্রেমানন্দ ভারতী।)

আহা কি অপ্রাকৃত ভাব ! কি মহান্ অনুভূতি ! ভক্ত ভিন্ন কি আর কেহ ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে ? ভক্ত ভিন্ন কি এমন দৃঢ়তার সহিত প্রাণের প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে কেহ গাহিতে পারে,—

প্রাণেত জেনেছি তুই প্রাণ কানাইরে,—
ব্রজের সে কালাচাঁদ,
নদীয়ার গোরাচাঁদ
সংশয়ত নাহি ইথে সংশয়ত নাইরে।

ভারতী মহাশয় প্রভুর একাধারে গৌর ও কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া নিঃসন্দেহ ভাবে—"সংশয়ত নাইরে" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়কে আমরা অন্নদা বাবুর সফল আবেশবাণী ও প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের অনুভূতি দেখাইলাম। এরূপ দৃষ্ট ফল দৈব ঘটনা যে প্রভুজগদ্বন্ধুর পূর্ণ ভগবত্তারই পরিচায়ক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন আর একটি অদ্ভুত আবেশবাণীর কথা শুনুন।

অবতারের দ্বিতীয়-প্রকাশ—সমাধিতে।

যশোহর জিলার অন্তর্গত হরিণাকুণ্ড গ্রামে শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবী নামে একটী মাতা আছেন। ইঁহার ভগবৎ ভক্তি বর্ণনাতীত, প্রায় সর্ব্বদাই আবেশে ঢল ঢল বিহ্বল অবস্থা। হরিকথা ভিন্ন মুখে অন্য কথা নাই! হরিনাম শুনিতে শুনিতে অমনি আবিষ্ট হইয়া পড়েন! পূর্ব্বে সমাধি অবস্থাতে একভাবে একাদিক্রমে সাত আট দিন পর্য্যন্তও কাটিয়া যাইত! যিনি একবার এই মাতাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দুই পাঁচ মিনিট আলাপ করিয়াছেন, তিনি হাজার পাষণ্ড হইলেও নিশ্চয়ই মায়ের অপ্রাকৃত ভাবে গলিয়া যাইবেন। আবেশ অবস্থায় মায়ের মুখ হইতে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নানা কথা বাহির হইয়া থাকে। মায়ের দুটি ছেলে আছে, বড়টির নাম নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; ছোটটির নাম ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী। ছেলে দুটি ঠিক মায়েরই ছেলে। যেমনি মা তেমনি ছেলে বটে। দু'টি ভাইই অতি পবিত্র ও ভক্তি-বিহ্বল। নির্ম্মলের পিতা স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও একজন খুব ভাল লোক ছিলেন। মায়ের আবেশ অবস্থার সময় দুটী ভাই কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং যেসমস্ত ভগবৎ কথা মুখ হইতে নিঃসৃত হয় যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখেন। মা প্রায়ই আবেশে বলিয়া থাকেন, "ভগবান আবির্ভূত হইয়াছেন, —জগৎ আনন্দময়!!" আজ নির্ম্মল কাছে আছে, সমাধি অবস্থাতে মায়ের মুখ দিয়া এক অদ্ভুত দৈববাণী হইল—

'এবার জগদ্বন্ধু অবতার।'

আশ্চর্য্যের বিষয় মাতা বা তাঁহার ছেলেরা কেহ প্রভু জগদ্বন্ধু সম্বন্ধে কখনও কিছু জানেন না। এমন কি জগদ্বন্ধুনামে কোন মহাপুরুষ আছে বলিয়াও কখনও শুনেন নাই।

মাতার আবেশ ঘুচিয়া গেলে, নির্ম্মল বলিল, মা! ভগবান যে জগদ্বন্ধু নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কোথায়? আমি যাই, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দেখি কোথায় আছেন। মাতা বলিলেন, এখন তোমার সময় হয় নাই, এক বৎসর পরে যাইও। নির্ম্মল অমনি সেই দিন হইতে এক বৎসর ঠিক রাখিবার জন্য সন, তারিখ উল্লেখ করিয়া 'জগদ্বন্ধু দর্শন' কথাটি বড় বড় অক্ষরে দেয়ালে লিখিয়া রাখিল। প্রাণে বড়ই আনন্দ, আজ হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে সে ভগবানের অবতার জগদ্বন্ধু-দর্শনে বাহির হইবে।

ঐ গ্রামে কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস নামে একটি ভক্ত, গুরুমাতার মন্ত্রশিষ্য আছেন। কুঞ্জ, স্বপ্নে এই গুরুমাতাকে ইষ্টভাবে দর্শন করিয়া আসিয়া দীক্ষিত হন। নতুবা মন্ত্র দেওয়া মায়ের ব্যবসায় নহে। কুঞ্জবিহারীর ভাব, ভক্তি ও অবস্থা আমি বর্ণন করিতে অক্ষম। তবে এইমাত্র বলি কুঞ্জবিহারী বাস্তবিকই নিকুঞ্জ-বিহারীর একজন অন্তরঙ্গ প্রিয় পাত্র। আমাদের এদেশের ভাব ও ভাষার সহিত কুঞ্জবিহারীর কিছুই মিল নাই। এই কুঞ্জবিহারীর মতই শ্যামপদ নামক আর একটি বালক-ভক্ত এই গ্রামে আছে। সে ঝিনাইদহ জয়-

নিতাই নামক একজন মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া তথায় কয়েক দিন কীর্ত্তন-আনন্দে অতিবাহিত করে। ঐ মহাপুরুষ শ্যামপদকে খুব স্নেহ করিতে লাগিলেন। কেননা শ্যাম এই বালক বয়স হইতেই অতি সরল ও ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন। বালকের অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সেই মহাপুরুষটি বলিলেন,—ভাই! আর চিন্তা কি? প্রভু এবার জগদ্বন্ধু নামে জগদুদ্ধারণে আসিয়াছেন। নবানুরাগে উদ্ভ্রান্ত কুমার আজ ভগবানের আবির্ভাবের কথা শুনিয়া বড়ই সানন্দচিত্তে বাড়ীতে আসিয়াছে। হঠাৎ কুঞ্জবিহারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, উভয়েই ভক্ত! মাতালে মাতালে ঢলাঢলি অনিবার্য্য! উভয়ে প্রাণ খুলিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একগ্রামবাসী হইলেও ইতিপূর্ব্বে চক্ষের দেখা ভিন্ন আর এরূপ ভাবে প্রাণের মিলন হয় নাই। আজ হরি কথা কহিতে কহিতে, শ্যামপদ ঝিনাইদহের ঘটনা উল্লেখ করিয়া সমস্ত বলিলেন। কুঞ্জ শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিল, ভাই! আমার গুরুমাও ত আবেশে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন!! তখন আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া উভয়ে গুরুমার নিকট চলিল। যাইয়াই দেখে, বড় বড় অক্ষরে, দেয়ালে লেখা রহিয়াছে, "জগদ্বন্ধু দর্শন!" দেখিয়াই শ্যাম অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এই লেখার কারণ জানিতে ব্যস্ত হইল। মায়ের আবেশ অবস্থায় "এবার জগদ্বন্ধু অবতার" কথাটি যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন গুরুমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। মা বলিলেন,

কি জানি বাবা! আমি তা কিছু জানি না। তবে সময় সময় আমার কি রকম একটা অবস্থা হয়, তখন কি বলি না বলি যাহারা কাছে থাকে তাহারাই জানে। আজ মহাপুরুষের মহাবাক্যের সহিত আবিষ্ট অবস্থার দৈববাণী, এবং দৈববাণীর সহিত মহাপুরুষের বাক্য ঐক্য হইয়া উভয় পক্ষকেই আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। আজ ভগবানের আবির্ভাবের আনন্দময় বার্ত্তা—সকলকেই বিস্ময়ে অভিভূত করিল। কিন্তু বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় এই—ইতিপূর্ব্বে ইঁহারা কেহই জগদ্বন্ধু নামে কোন মহাপুরুষ আছেন বলিয়াও শুনেন নাই।

এমনি করিয়াই শ্রীভগবান আবির্ভাবের সময় আপনার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে নানা প্রকারে নিজের আবির্ভাব জানাইয়া থাকেন। এইরূপেই বাল্মীকিকে রামচন্দ্রের আবির্ভাব, গর্গমুনিকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, মায়াদেবীকে স্বপ্নে বুদ্ধের আবির্ভাব জানাইয়াছিলেন। আজ আবার আপনার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে আবেশে অত্যদ্ভুতরূপে আপনার আবির্ভাব জানাইলেন। অজ্ঞাত কুলশীল, দুইজন ভক্তের মুখে প্রকাশিত এই দৈববাণী দুটিই বোধ হয় প্রভু জগদ্বন্ধুর ভগবত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ। শুধু ইহাই নহে, পাঠক মহাশয় আরও দেখুন, ভগবান এবার জীবকে ধরা দিবার জন্য কত ব্যস্ত! কত ভক্তের নিকটে কতভাবে, আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন।

অবতারের তৃতীয়-প্রকাশ—সিদ্ধ-মহাপুরুষের ত্রিকালজ্ঞ-জ্ঞানে।

পরম ভাগবৎ নিত্যসিদ্ধ পরমহংস সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণের নাম বোধ হয় সকলেই জানেন। তিনি পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য। বালকৃষ্ণ সাধনমার্গে সিদ্ধ পরমহংস, আবার এদিকে নব্য বিদ্যায়ও পরমপারদর্শী। বি, এ, পাশ করিয়া এম, এ, পড়িয়াছেন। ইনি নীলাম্বুধি নামে একখানা গ্রন্থে বর্ত্তমান অবতারের মহাউদ্ধারণ লীলা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু শ্রীহরিপুরুষ,
প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমবন্যা বেগে
ভাসাইবে ত্রিজগত ; সুরনরনারী,
যক্ষ রক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি সব,
পশুপক্ষী চরাচর স্থাবর জঙ্গম।

কর্ম্মীজ্ঞানী বাসভূমি, ইউরোপ, রুষ,
জর্ম্মাণ ডেন্মার্ক, ফ্রান্স, আর্ল্যাণ্ড, হলাণ্ড,
জাপাণ প্রভৃতি দ্বীপ সর্ব্ব মহাদেশ
গ্রাম দেশ পল্লী পাড়া, নগর সহর,
আমেরিকা ও আফ্রেকা, বিশ্বচরাচর
অচিরে ভাসিবে গৌর প্রেমের বন্যায় !

মাতিবে তাণ্ডব নৃত্যে হরি সঙ্কীর্ত্তনে
মহারাস নৃত্য-রসে, উন্মত্ত হইবে,
কৃৎস্ন বিশ্বচরাচর "রাধে রাধে" বলি।
"রাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ জগদ্বন্ধু জয়।"
গাইবে পঞ্চম স্বরে পরম হরিষে !

প্রেমধাম শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা কৃষ্ণ ময়
জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু শ্রীহরি পুরুষ,
অবতরি মহাপ্রভু জগদুদ্ধারণ
শাস্তা পাতা বিশ্বম্ভর প্রেম অবতার !

নৃত্যকর ভক্ত বৃন্দ ! পরাণ খুলিয়া,
গাও জগদ্বন্ধু নাম ; প্রাণবন্ধু গাও,
শ্রীহরি পুরুষ গাও শ্রীপুরুষোত্তম।
অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্তি প্রেমভক্তি ভরে
হর্ষে নাচে বালকৃষ্ণ মহা মহোল্লাসে !
অবতার প্রকাশের আইল সময়,
মহাপ্রকাস উচ্ছ্বাসে নাচিবে অচিরে,
প্রেমানন্দে মাতি সবে গৌরাঙ্গ নিরখি !!!

জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু প্রাণ খুলি গাও,
জগদ্বন্ধু সঙ্কীর্ত্তন গাও ভক্তি ভরে

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ সঙ্গীত।

(বেহাগ—আড়াঠেকা।)

কোকোনদ বিনিন্দিত জগদ্বন্ধুর চরণ।
প্রেম-ভক্তিভরে সবে স্মর অনুক্ষণ॥
সুখে বল জগদ্বন্ধু হৃদে ভাব প্রাণবন্ধু।
রিপুকুল হ'বে বন্ধু, পালাবে শমন॥
পূতরাঙ্গা পা দুখানি প্রেম-প্রস্রবণ,
রাধাপ্রেম-পারাবার উদ্ধারণ-অবতার,
সবে জয় গাও তাঁর করি প্রাণপণ।

(ললিত—আড়াঠেকা।)

'জয় জয় জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু প্রাণেশ্বর,
মাতাও গৌরাঙ্গ প্রেমে কৃৎস্ন বিশ্বচরাচর।
কৃপা-কর-পরকাশি বিনাশ তিমির রাশি,
অকলঙ্ক রাকা শশী উজ্জ্বল কর অন্তর।
জগতজীবের বন্ধু তুমি প্রভু প্রাণবন্ধু
দীনবন্ধুকৃপাসিন্ধু শ্রীপদে দাও স্মরণ।
(হৃদে শ্রীপদ বিতর) (করুণাবারি বিতর),
এশিশু পতিত জন, তুমি জগদুদ্ধারণ,
শ্রীপদে যাচে শরণ বালকৃষ্ণ সমুদ্ধর।

(পূরবী—আড়াঠেকা।)

আয়ু ভানু অস্ত যায়, জগদ্বন্ধো উদ্ধারণ,
এখনো না দিলে দেখা, কবে দিবে দরশন!

শ্রীহরি পুরুষ তুমি, তোমারি বালক আমি,
অন্তরাত্মা অন্তর্য্যামী শিরে ধর শ্রীচরণ !
শ্রীহরি কীর্ত্তন গাব, নেচে গেয়ে প্রাণ জুড়াব,
প্রেমানন্দে সদা রব, কর এই ভিক্ষাদান।
তব যত ভক্তগণে নিবেদিব প্রাণপণে,
সবে মিলি রাত্রদিনে গাব তব সঙ্কীর্ত্তন !
বালকৃষ্ণ প্রাণারাম, বন্ধু নয়নাভিরাম,
তুমি গৌর কৃষ্ণ রাম সুরেশ্বর নারায়ণ।
যা কিছু সকলি তুমি, তব কৃৎস্ন বিশ্বভূমি,
তোমারিত শিশু আমি স্বক্রোড়ে কর ধারণ।
অতুল কৃষ্ণ জীবন রমেশাদি* প্রাণধন
বালকৃষ্ণ সঞ্জীবন, বিতর প্রেমজীবন।"

পাঠক মহাশয় ! পরমহংস সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীপ্রভু-জগদ্বন্ধু সম্বন্ধে কি তত্ত্ব লিখিয়া গ্রন্থাকারে সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিয়াছেন, দেখিলেন ত ? বালকৃষ্ণ নিজে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি প্রভুজগদ্বন্ধুর শিষ্যও নহেন এবং কখনও তাঁহার শ্রীঅঙ্গনে আসেনও নাই, অথচ লীলাম্বুধিনামক গ্রন্থে তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন :—

"তুমি গৌর কৃষ্ণ রাম সুরেশ্বর নারায়ণ।"

প্রভু জগদ্বন্ধুর একাধারেই যে, পূর্ণলীলার সময় গৌর, কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ প্রভৃতি সর্ব্বশক্তি সম্মিলিত তাহা

---

* শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ চম্পটি ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত।

বালকৃষ্ণের উক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে দেখা যাইতেছে। বালকৃষ্ণ সমস্ত জগৎবাসী নরনারীকে,এমন কি কৃমিকীটকে পর্য্যন্ত আশ্বাস দিতেছেন, "তোমরা অচিরেই তাঁহার মহাপ্রকাশে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইয়া যাইবে, বলিতেছেন,—আর চিন্তা নাই অবতার প্রকাশের সময় আসিয়াছে।" পাঠক মহাশয় বলুন দেখি, শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুকে পূর্ণ-ভগবান বলিয়া প্রকাশ করার মূলে,বালকৃষ্ণের কি স্বার্থ আছে ? এবং এই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ঘোষণা আপনার অবিশ্বাস করিবারই বা কি কারণ আছে ? তিনি ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধমহাপুরুষ বলিয়াই শ্রীভগবানের বর্ত্তমান অবতার সম্বন্ধে অভ্রান্তরূপে জানিয়া নামোল্লেখ পূর্ব্বক ভাবীলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যদি সাধারণ সাধুসন্ন্যাসীর মত, আত্মপ্রতিষ্ঠাতে মুগ্ধ থাকিতেন, তবে হয়ত নিজেই অবতার সাজিতেন ; আর না হয় ত, ভগবৎশক্তি-সম্পন্ন পরমপ্রেমিক পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কেই অবতার সাজাইয়া প্রচার আরম্ভ করিতেন। আজ কাল, যে সমস্ত সাধুসন্ন্যাসীকে তাঁহাদের ভক্তগণ অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কোনটি হইতেই কম নহেন, এবং বালকৃষ্ণ নিজেও একজন কোন অংশে ন্যূন নহেন। এমত অবস্থায় তিনি যে শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুকে শ্রীশ্রীভগবানের পূর্ণ-অবতাব বলিয়া জগৎবাসীকে জানাইতে-ছেন, ইহা যে অভ্রান্ত সত্য তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

অবতারের চতুর্থ-প্রকাশ—মহাপুরুষের স্বপ্নে।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে যেমন মায়াদেবী অপূর্ব্ব স্বপ্নে বুদ্ধের আবির্ভাব জানিয়াছিলেন, সেইরূপ বর্ত্তমান অবতারেও শ্রীভগবান, অনেক মহাপুরুষকে আপনার আবির্ভাবটি বৈচিত্র্যময় অদ্ভুত স্বপ্নযোগে জানাইতেছেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধুত ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় ভক্ত চিরত্যাগী পরম-বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীবৃন্দাবনধামে ৺রামদাস কাঠিয়া বাবার আশ্রমে অবস্থান কালে, নিম্নলিখিত অদ্ভুত স্বপ্নটি দর্শন করিয়া ১৩১৯ সনের আষাঢ় মাসের শেষভাগে শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে অনুরাগভরে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়া ৩১শে আষাঢ় সোমবার প্রভুর তাৎকালিক সেবাইত শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক অবিকল লিখিত হইয়াছিল। স্বপ্নটি এইরূপ ঃ—

"একটি স্থানে সহস্র সহস্র অত্যুজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি, একখানা স্বর্ণ-সিংহাসন ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! সিংহাসন খানি বহুমূল্যমণিমুক্তাখচিত। সিংহাসন দর্শন করিয়া ঐ অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি সকল যারপর নাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। তখন দ্বারকানাথ দাস বাবাজী মহাশয়,তাঁহার গুরুদেব শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ সিংহাসন কাহার? ইঁহারা সকলে এখানে এমন কৌতূহল পরবশ হইয়া দাঁড়াইয়া কেন? গুরুদেব বলিলেন,—"ইঁহারা ভগবানের পারিষদ। তিনি অবতীর্ণ

হইয়াছেন, শীঘ্রই সমস্ত পৃথিবীতে এক সত্য-ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মই একমত হইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। হিংসা, দ্বেষ, কলহ, মারামারি, মহামারি, দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর যত অমঙ্গল সব দূর হইয়া যাইবে। সমস্ত জগতে শান্তির ফোয়ারা ছুটিবে!" বাবাজী মহাশয়, তাঁহার গুরুদেবকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান এসেছেন, তিনি কোথায়? তাঁহার নাম কি? গুরুদেব বলিলেন,—তাঁহার বর্ত্তমান নাম, 'প্রভু জগবন্ধু'। এই বলিয়া তিনি বাবাজীকে সঙ্গে লইয়া একখানা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যাইয়া দেখেন তথায় একখানা চৌকির উপর একটি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ ঘর আলো করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার পা দুখানি খুব রাঙ্গা ও খুব বড়। তাহাতে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন রহিয়াছে। শ্রীঅঙ্গের বর্ণ মুহূর্ত্ত মধ্যে নানা প্রকার বদলাইয়া যাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার নানাপ্রকার ভাব লক্ষিত হইতেছে। কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন। সমস্ত ভাব গুরুদেব বাবাজীকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,— 'ইনিই ভগবান,' সব ছেড়ে দিয়ে ইঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয় লও। শুনিতে শুনিতে বাবাজীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; তখন রাত্রি প্রায় ৪ৄটা বাজিয়াছে।

কি অত্যদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্ত!! ভগবানের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, তাঁহার আবির্ভাবের সময় অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে এইরূপ অদ্ভুতভাবেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া থাকেন।

এই স্বপ্ন বৃত্তান্তকে পাঠক মহাশয়েরও অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করার উপায় নাই। ভগবৎবিষয়ক স্বপ্ন সব সত্য। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংস দেবের শ্রীমুখেও একথা বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে;—কথামৃতে দেখিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় অবধুত ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য এই বাবাজী মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে প্রভু জগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে কখনও আসেন নাই এবং প্রভুর বিষয় তাঁহার চিন্তা করিবারও কোন কারণ নাই। কেননা তিনি বৃন্দাবনবাসী, তথায় থাকিয়াই দিবানিশি হরিনাম করেন। যাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই, যাঁহার বিষয় কখনও স্মৃতিপথে স্থান দিবার প্রয়োজন হয় নাই, সেই অজ্ঞাত অপরিচিত প্রভুর সম্বন্ধে এরূপ ব্যাপার, অকস্মাৎ এরূপ বৈচিত্র্যময় নানাতত্ত্ব-সম্বলিত ভাবী-লীলাকাহিনীপূর্ণ অদ্ভুত স্বপ্ন, শ্রীভগবানের কৃপা-নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। ধন্য গুরু, ধন্য শিষ্য! ইঁহাকেই বলে গুরু—যিনি এমনি করিয়া শিষ্যকে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। ভগবৎ-শক্তি-সম্পন্ন নিত্য-সিদ্ধ অবধুত ঠাকুর মহাশয়ের এরূপ ভক্তবৎসলতা সহজ ও স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। ক্রমে আমরা এইরূপ আরও অদ্ভুত ঘটনা উল্লেখ করিয়া দেখাইব;—এসব ভগবানেরই আবির্ভাবের পূর্ব্বসূচী বা ঘোষণামাত্র। যুগে যুগেই ভগবৎ ইচ্ছায় ভক্তগণ তাঁহার আবির্ভাব পূর্ব্বেই জানিতে পারেন, এবারও দয়া করিয়া তিনি পারিষদবর্গকে জানাইতেছেন। মায়ার সংসার-পরিবার, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সবই অনিত্য ও অমূলক, তাই মায়ার স্বপ্নও অমূলক। শ্রীভগবান নিত্য, তাঁহার তত্ত্ব

নিত্য, কাজেই তৎসম্বন্ধীয় স্বপ্নও নিত্য-সত্য। ভগবৎস্বপ্নে অবিশ্বাস, ভগবানে অবিশ্বাসের ন্যায় মায়ার ভ্রান্তিমাত্র।

অবতারের পঞ্চম-প্রকাশ—মহাপুরুষের স্বপ্নে।

বৃন্দাবন—বর্ষাণা—রাধাবাগে অবস্থানকালে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য সন্ন্যাসী কুমারানন্দ অবধুত মহাশয়, নিম্নলিখিত অদ্ভুত স্বপ্নটি দর্শন করিয়া মহেন্দ্রকে* বলিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের নিকট শুনিয়া নিম্নে স্বপ্নবৃত্তান্তটি অবিকল লিপিবদ্ধ হইল।

একটি সুবিস্তীর্ণ সুরম্য রাজপ্রাসাদের ভিতরে শ্রীশ্রীপ্রভু-জগদ্বন্ধু রহিয়াছেন। চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অবিরাম হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে। অবধুত কুমারানন্দ তখন শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ব্যাকুল ভাবে মন্দিরে প্রবেশের দ্বার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে একটি গবাক্ষ দেখিতে পাইয়া আগ্রহ সহকারে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া সোৎসুকচিত্তে দেখিতে লাগিলেন,—মন্দিরের সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠটি নানাপ্রকার বহুমূল্য সম্রাটোচিত সাজসজ্জায় সুসজ্জিত। মধ্যস্থলে একটি বিচিত্র সিংহাসনে শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু রাজবেশে সমাসীন। প্রভুর সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়রূপ দেখিয়া সন্ন্যাসীজী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যাকুল

---

* 'মহেন্দ্র' শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর সেবাইত। অনুমান দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে রাধাবাগে অবস্থানকালে শ্রীমৎ কুমারানন্দের নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন।

ভাবে এদিক্ সেদিক্ ছুটিতে ছুটিতে একটি দরজা খোলা দেখিয়া দ্রুতপদে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অমনি চারিদিক্ হইতে প্রভুর ভক্তবৃন্দ, মন্দিরে কে প্রবেশ করিল,—কে প্রবেশ করিল বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। প্রভু বলিলেন,—"ইহাকে আসিতে দেও।" অবধূত কুমারানন্দ অমনি ছুটিয়া গিয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, তিনি যেন নিষেধ করিলেন। কুমারানন্দ দেখিলেন, ইনি যেন কত আপনার, কত পরিচিত। ইঁহার মত আপনার জন যেন আর ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় নাই। যেখানে আপনার ভাব, সেখানে নমস্কার ও প্রণামের হুড়াহুড়ি থাকে না। দাস্যভাবে শুধু নমস্কার। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি ভাবে আত্মবিস্মৃতি-মূলক প্রেমের ভাব—আপনার ভাব। কুমারানন্দ আজ প্রভুকে সেই আপনার ভাবে, একমাত্র আপনার জনরূপে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। আজ কুমারানন্দ, অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীবেশে ইতস্ততঃ বেড়াইলেও, শ্রীভগবান দয়া করিয়া নিজ আবির্ভাব জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রেমের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধটিও জানাইয়া দিলেন। শ্রীমৎ কুমারানন্দ অবধূত এবং ভক্তপ্রবর দ্বারকানাথ বাবাজী মহাশয় উভয়েই ভগবান জগদ্বন্ধুর রাজবেশ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, বাস্তবিকই শ্রীভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি। তিনি মানবের রাজা, দেবতার রাজা—একমাত্র রাজরাজেশ্বর—একমাত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্। তিনি ভোগের রাজা নহেন, যোগের রাজা,—যোগেশ্বরেশ্বর !! মরি মরি !

আজ গোলোকের ধন ভূলোকে পাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক অবিরত প্রেমানন্দে ঘিরিয়া ঘিরিয়া হরিনাম করিতেছে। এইরূপ ঘিরিয়া ঘিরিয়া অগণিত কণ্ঠে হরিনামই পাঠক মহাশয় বর্ত্তমান মহাবতারীর ভাবীলীলার আভাসস্বরূপ জানিবেন। আরও জানিবেন,—এইরূপ দুইজন মহাপুরুষের অদ্ভুত-স্বপ্ন-বৃত্তান্ত যে শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর পূর্ণ-ভগবত্তা জগৎকে জানাইতেছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অবতারের ষষ্ঠ-প্রকাশ মহাপুরুষের স্বপ্নে।

পাঁচ ছয় বৎসরের কথা; তখন অজ্ঞাতকুলশীল ছিন্ন কন্থাধারী চিরকুমার-ব্রহ্মচারী একটি ত্যাগী-ভক্ত বৃন্দাবনের বনে বনে আপন মনে পাগলের মত কত কি বলিয়া হাসিত, কাঁদিত, নাচিত, গাহিত, কখনও হরি হরি বলিয়া, রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চীৎকার করিয়া নিবিড় বনে ছুটিত। সেই পাগলের একটি অদ্ভুত স্বপ্ন এখানে উল্লেখ করিয়া দেখাইব। পাগলটাকে দে'খতেও পাগল, কাজেও পাগল! এ স্বভাবসিদ্ধ পাগল। যখন কৈশোর সমাগমে, আমরা কামিনী-কাঞ্চনের মোহ-মদিরায় পাগল হইয়া সংসার-গারদে ঢুকিয়া শৃঙ্খলা-বদ্ধ পাগলের অভিনয় করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন 'এ' হরি হরি করিয়া পাগল হইয়া সংসার হইতে ছুটিয়া শ্রীহরির অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল। এ অপরিচিত, অজ্ঞাত-কুলশীল প্রেমের পাগল এখন আমাদের পরিচিত। এ পাগল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে তাহার আপনার

করিয়া লইয়াছে। আমরা তাহাকে চাই বা না চাই, সে কখনও আমাদিগকে ভুলে না, ছাড়ে না, এ পাগল আজকাল সংক্রামক ব্যাধিতে অনেককে পাগল করিবার যোগাড় করিয়াছে।

'এ' পাগলের নাম মহেন্দ্র। পিতা—পরম পূজ্যপাদ ৺হরিশ্চন্দ্র দেববর্ম্ম সরকার। বাড়ী যশোহর—নড়াইল—ফুল বদিনা গ্রাম। শৈশব হইতেই মহেন্দ্র উন্মনস্ক। শৈশব হইতেই হরিনামের পড়া ভিন্ন আর কোন পড়াতে মনোনিবেশ করে নাই। বিদ্যালয়ে মাষ্টার মহাশয় আঁক কসিতে দিতেন, পাগল, বসিয়া বসিয়া শ্লেট ভরিয়া হরি হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ লিখিত। অতি অল্প বয়সেই—কৈশোরের নবানুরাগের নূতন-বানে মহেন্দ্রকে ভাসাইয়া পাগল করিয়া বৃন্দাবনে আনিল। তথায় কয়েক দিন গৌরাঙ্গ-দরিদ্রালয়ে সেবাশ্রমে ছিল। আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম-পূজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বামী ইহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। পাগলের কিন্তু ওসব ঐশ্বর্য্যের সংস্রব ভাল লাগিল না। তাই কৌপীন সম্বল করিয়া ওখান হইতে রাধাবাগে ছুটিয়াছিল। পাগলের বেশেই পাগলকে মানায় ভাল। তাই, ছেড়া কাঁথা সম্বল করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া, হরি হরি বলিয়া পাগলের মত চীৎকার করিত। পাগল, কোন সাধুসন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সমাজে বড় একটা মিশিতে পারিত না। কারণ ইহার মালা নাই, তিলক নাই, গেরুয়া নাই, চিমটা নাই, করোয়া নাই, এমন কি কাণে 'ফুটা' পর্য্যন্তও নাই। তাই কোন সাধু-বৈষ্ণবের কাছে যাওয়াই মুস্কিল ছিল। 'এ' পাগলের বেশ কেহই

পছন্দ করিত না। যাহার কাছে যাইত, সেই বলিত মন্ত্র লও, মালা তিলক লও, নতুবা যে ভেসেই গেলে গো! পাগল, সর্ব্বদা পাগলামিতেই ডুবিয়া আছে, তাই ভাসিয়া যাওয়ার ভয়ে ভীত হইত না। আপন মনে সর্ব্বদা হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধে রাধে বলিয়া ডাকিত, হাসিত, কাঁদিত, নাচিত, গাহিত!! কোথাও প্রাণ তিষ্ঠিত না! কত সাধুভক্ত দেখিত, সিদ্ধপুরুষ দেখিত, কাহারও নিকট মাথা বিকাইতে প্রবৃত্তি হইত না! সর্ব্বদা কি যেন নাই, কি যেন ছিল, কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে, কোন্ পথে কোথায় গেলে যেন আবার মিলিবে!! কোথায় হরি? কৈ হরি! একবার এস! দেখা দেও! এসে কাছে দাঁড়াও! দুটি কথা কও! প্রাণের সাধ মিটাইয়া লই! নতুবা শুধু নামে আনন্দ কৈ? শুধু ভোগ-নিবেদন করিয়া প্রসাদ খাইয়া শান্তি কৈ? যদি তোমাকে না পাইলাম, না দেখিলাম, না খাওয়াইলাম, দুটি কথা না শুনিলাম, তবে, প্রাণের শান্তি কৈ? শুধু কীর্ত্তনে আনন্দ, প্রসাদে আনন্দ, এই আনন্দ পর্য্যন্তই কি সাধন ভজনের চরম পরিণতি? যে চায় সে চা'ক, আমি এ আনন্দ চাই না, আমি এ তৃপ্তি লইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব না! আমি এই আনন্দ লইয়া সাধুসাজে সাজিয়া জীবন কাটাইতে পারিব না! হে নাথ! হে প্রভো! আমি চাই তোমাকে, আমি চাই তোমার সেবা, আমি চাই তোমার তৃপ্তি, তোমার আনন্দ!

পাগল এই রূপ অদম্য অনুরাগে ছট্‌ফট্ করিয়া বৃন্দাবনের বনে বনে ঘুরিতেছে, হঠাৎ একদিন কল্পনাতীত অদ্ভুত স্বপ্ন!!— "একটি প্রশস্ত সুন্দর রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথে

চলিতে চলিতে দেখিতে পাইল, এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-মূর্ত্তি দিগন্ত আলোকিত করিয়া রাস্তার পার্শ্বে ঊর্দ্ধবাহু করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! আহা। এমন সুন্দর রূপত এ জীবনে দেখি নাই!! ইনি কে? এমন প্রাণারাম ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া ইনি কে? শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম শুনিয়াছি, ইনি কি তিনি? মনে হইল—ইনিই সেই সোণার গৌর! অমনি কে যেন পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া, পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল,—"ইনিই শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু"!! মুহূর্ত্তে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, আহা! এমন সুন্দর রূপত কখনও দেখি নাই!! ইনিই প্রভু-জগদ্বন্ধু!! তিনি আবার কে? জগদ্বন্ধু বলিয়া ত কাহাকেও জানি না!! জানি বা না জানি। আহা কি ভুবন-মোহন রূপ!! কি মন-প্রাণ চুরি-করা রূপ!! কি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি!! দিনের পর দিন চলিয়া গেল কিন্তু সে মধুর মূর্ত্তিখানা হৃদয় হইতে একটুকুও অপসৃত হইল না! অবিরতই প্রাণের নিভৃত প্রদেশে সেই মূর্ত্তি! আর সেই সুধাময় স্বরে প্রাণের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া অবিরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—ইনিই জগদ্বন্ধু!!

দূর হ'ক ওসব বৃথা চিন্তা। হরিবোল হরিবোল বলিয়া, রাধে রাধে বলিয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া বেড়াব, তার মধ্যে এ আবার কি হ'ল, কে যেন প্রাণের ভিতর অবিরত বলিতেছে, ইনিই জগদ্বন্ধু!! প্রাণে অবিরত উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে সেই মূর্ত্তিখানি।

কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইল, আজ হঠাৎ, ব্রহ্মকুণ্ডে

একটি সাধুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি কাছে আসিয়া বসিয়া একথা সেকথা বলিতে বলিতে,বলিতে লাগিলেন— আপনি প্রভু-জগদ্বন্ধুকে জানেন? আমি তাঁর ভক্ত। মহেন্দ্র অতি বিস্ময়ের সহিত আজ একজন পরম সাধুর মুখে অকস্মাৎ প্রভু-জগদ্বন্ধুর নাম শুনিতে পাইল! একি? এ আবার কি আর এক স্বপ্ন!! আহা 'এ' স্বপ্ন হ'লেও কি মধুর!!

সাধুর সহিত মহেন্দ্রের প্রভু-সম্বন্ধে নানা কথা হইল। তিনি কোথায় আছেন? কোন্ পথে সেখানে যাইতে হয়, মহেন্দ্র সমস্ত জানিয়া লইল। এই চিরকুমার ত্যাগী-সাধুটি, শ্রীশ্রীপ্রভুর একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত, নাম শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাস।

অতঃপর মাঝে মাঝে স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিয়া আকুল করিতে লাগিল, এক একদিন কত উপদেশ দিতে লাগিল, এখন বৃন্দাবনে থাকা দায় হইয়া উঠিল। প্রায় সর্ব্বদাই মন-প্রাণ, প্রভু-জগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে উধাও হইয়া ছুটিয়া যাইতে চায়। একি হইল! আমি সংসারত্যাগী বৃন্দাবনবাসী হইয়াছি, এইখানে জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া নাচিয়া কাঁদিয়া বনে বনে বেড়াইব, তা আবার একি হ'ল! এ যে মন-প্রাণ, বৃন্দাবন ছাড়িয়া ফরিদপুর জেলায় গোয়াল চামট গ্রামে প্রভু-জগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গন বলিয়া পাগল হইয়া উঠে! কেন এমন হ'ল! না, না, আমি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। লোকে সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসে, আর আমি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায় যাইব? ঐ আবার ওকি?

সেই মূর্ত্তি প্রাণের ভিতর জাগিয়া যে আকুল করিয়া ফেলে! ঐ সেই মূর্ত্তি! ঐ সেই নাম!! যদি বৃন্দাবনে থাকিয়া সেই মূর্ত্তি ও সেই নামে অবিরত বিহ্বল থাকিতে হয়, তবে, একবার সেখান হইতে ঘুরিয়া আসাটা মন্দ নয়। আর বৃন্দাবনে থাকা ঘটিল না, বৃন্দাবনচন্দ্র এখন স্বয়ং যেখানে বসিয়া আছেন, বৃন্দাবন হইতে জোর করিয়া তথায় টানিয়া আনিলেন, পাগল,—পাগল হইয়া প্রভুর কাছে ছুটিয়া আসিল। যাঁহার জন্য শৈশব হইতে পাগল হইয়া, হা হরি! কোথায় হরি! বলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, আজ প্রাণের প্রাণ হৃদয়নিধিকে পাইয়া, পূর্ণশান্তি, পূর্ণ-আনন্দ, পূর্ণতৃপ্তি!! শ্রীশ্রীপ্রভুর একাধারে রাধাকৃষ্ণ, নিতাই-গৌর প্রভৃতি সমস্ত লীলা-মাধুরী প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া প্রাণের সব সাধ মিটিয়া গেল। এবার কান্না-কাটি, হাহাকার, চীৎকার ও ছুটাছুটি সব ঘুচিয়া গেল। এই মহেন্দ্র এখন শ্রীশ্রীপ্রভুজগবন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে থাকিয়া প্রভুর সেবার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

মহেন্দ্রের একমাত্র ভাবনা ছিল শ্রীহরির সাক্ষাৎলাভ করা, তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা করা। তাই আজ শ্রীভগবানের পূর্ণ-অবতারী শ্রীশ্রীপ্রভুজগবন্ধুহরি তাহাকে বৃন্দাবন হইতে টানিয়া আনিয়া আপনার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ধন্য ভক্ত, ধন্য ভক্তবৎসল শ্রীহরি!! কাহারও প্রাণ তোমার জন্য কাঁদিয়া উঠিলে, তুমি এমনি করিয়াই আপনার প্রেমের বুকে তুলিয়া লইয়া বাসনা চরিতার্থ কর। এ দৃষ্টান্ত নূতন

নহে,—ধ্রুব-প্রহ্লাদের আদর্শ, গোপীদের আদর্শ, কত আদর্শই শ্রীহরি যুগে যুগে আমাদের সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু রাখিলে কি হইবে? আমরা যে একবারও সেদিকে ফিরিয়া চাহি না!! একবারও প্রাণ খুলিয়া বাস্তবিক তোমাকে ডাকি না বা চাই না!! নাম করি, নাম করার জন্য, কীর্ত্তন করি, গান করার জন্য, আনন্দের জন্য। পুত্রহারা পাগলিনীর মত, পতিহারা সতীর মত, একবারও ত তোমার নাম ধরিয়া ডাকি না, একবারও ত কোথায় তুমি বলিয়া 'পাগলের' মত ছুটি না! কিন্তু তবু তোমার দয়ার ত অন্ত নাই, তোমার প্রেমের ত পার কূল নাই, যখনই আমাদের অত্যন্ত দুর্দ্দশা দেখ, তখনই নিত্য-সুখময় গোলোকধাম ছাড়িয়া, এই দুঃখের জগতে আসিয়া কত কষ্ট পাইয়া পথভ্রান্ত আমাদিগকে পথ দেখাইয়া, অন্ধ আমাদিগকে চক্ষু দান করিয়া আপনার প্রেমের বুকে তুলিয়া নিত্যধামে চলিয়া যাও! এবারও জগতের দুর্গতি দেখিয়া জগদ্বন্ধুরূপে আসিয়াছ, মহাপ্রকাশের পূর্ব্বেই নানাভাবে, আপনার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে আগমনের শুভমঙ্গলময় বার্ত্তা জানাইয়া আশ্বস্ত করিতেছ! "মাভৈ! আমি আসিয়াছি—এবার জগতের বন্ধুরূপে জগৎকে শান্তিদান করিতে আসিয়াছি।" বিপদের সময় বন্ধুরই দরকার, এ সময় গুরুর উপদেশ কাণে প্রবেশ করে না, বন্ধুর আলিঙ্গন ভিন্ন বন্ধুর সান্ত্বনা ভিন্ন আর কিছুতেই আর্ত্তের প্রাণে শান্তি আসে না। তাই আর্ত্ত-জগতের করুণ-আহ্বানে আর্ত্তবন্ধু জগদ্বন্ধুর আবির্ভাব। এস জগৎবাসী আজ প্রত্যেকেই আপন আপনটি কড়ায় গণ্ডায়

বুঝিয়া লও। ঐ পূর্ণ-অবতারী পূর্ণশক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন,—এস হিন্দু! ঐ একাধারে তোমার কৃষ্ণ, গৌর ও নারায়ণকে বুঝিয়া লও। এস বৌদ্ধ! তোমার বুদ্ধকে বুকে করিয়া প্রাণ শীতল কর। এস খৃষ্টান! তোমার যীশুকে সোহাগের হৃদয়ে তুলিয়া চুম্বন করিয়া, বিগত ক্রুশ-বিদ্ধের মর্ম্মভেদী অনুতাপ ভুলিয়া যাও। সকলে বর্ত্তমান মহাবতারীর জয় ঘোষণা করিয়া বল:—জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় জগদ্বন্ধু হরি! পাঠক মহাশয়! অজ্ঞাত কুলশীল একজন প্রেমের পাগলকে বৃন্দাবন হইতে পাগল করিয়া টানিয়া আনাটাকে আপনি কি বলিতে চান? ইহা কি প্রভুর পূর্ণ ভগবত্তার পরিচয় নহে? এবার আরও দেখুন—

অবতারীর সপ্তম-প্রকাশ—ভগবানে অবিশ্বাসীর স্বপ্নে।

ফরিদপুর—কুঠীবাড়ী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পিতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য। অবিনাশ, খুব শান্ত,শিষ্ট ও বিনীত। এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়া কিছুদিন ফরিদপুর জিলা স্কুলে মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছে। অবিনাশ কতকগুলি মানসিক অশান্তিতে একেবারে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। এতই অশান্তি ঘটিয়াছিল যে, অনেক সময় এরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল মনে করিত। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় শরীর খারাপ হইল, হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সময়ে চিকিৎসার জন্য বাধ্য হইয়া একজন চিকিৎসকের নিকট যাইতে হইল। চিকিৎসকের সহিত পূর্ব্বের একটুকু সম্বন্ধ ছিল, কাজেই, অবিনাশের

মানসিক অনেক অবস্থা তাহার জানা ছিল। চিকিৎসক, অবিনাশকে মানসিক চিন্তা দূর করিতে উপদেশ দিতে লাগিল। অবিনাশ বলিল, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিছুতেই মন স্থির করিতে পারি না। চিকিৎসক বলিল, তোমার প্রধানই মানসিক ব্যাধি। আমি শারীরিক চিকিৎসক, শরীর সম্বন্ধে কিছু চিকিৎসা করিতে পারি বটে, কিন্তু তোমার মানসিক ব্যাধির প্রতিকার কে করিবে? মানসিক ব্যাধি না সারিলে— শরীর কিছুতেই ভাল হইবে না। অবিনাশ,—তা কি করিব, আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি কোন ফল হয় না। "আর ওচিন্তা করিব না" মনে করিলেও ত ঐ চিন্তাটিই স্মরণ করিয়া লইতে হয়। চিকিৎসক,—ভগবানের প্রতি নির্ভর কর, তবেই প্রাণে শান্তি আসিবে। অবিনাশ বিরক্ত হইয়া স্বভাবের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল! স্বভাব অনুসারেই সব হয়, আবার ভগবান টান্ কি? অনেক বাদানুবাদের পর চিকিৎসক বলিল,—অবিনাশ! তুমি ভগবান মান আর না মান মহাপুরুষের ঐশ্বরিক শক্তি ত মান? অবিনাশ,—আমি ওসব কিছু বুঝি না। চিকিৎসক,—আচ্ছা তুমি ত হিপ্নোটাইস্ (Hypnotise) করিতে পার, তুমি যদি অন্য লোককে ইচ্ছামত হাসাইতে কাঁদাইতে পার, তবে তোমা অপেক্ষা শক্তি সম্পন্ন যিনি, তিনি তোমাকে হাসাইতে কাঁদাইতে না পারিবেন কেন? তুমি এই যে, দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া দিবানিশি কাঁদিতেছ, তোমাকে তিনি ইচ্ছা করিলে কান্নার পরিবর্ত্তে হাসাইতে না পারিবেন কেন? অবিনাশ,—একথা আমি স্বীকার করিলাম। এটি

অসম্ভব নয়। চিকিৎসক,—তবে, তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে। দেহের চিকিৎসার জন্য যেমন, দৈহিক চিকিৎসকের নিকট আসিয়াছ, মানসিক চিকিৎসার জন্য সেইরূপ আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের নিকট যাইতে হইবে। নতুবা তোমার এ ব্যাধির প্রতিকার নাই। অবিনাশ,—তেমন মহাপুরুষ কোথায় পাই? চিকিৎসক,—তোমাদের নিকটবর্ত্তীই যিনি চৌদ্দবৎসর যাবৎ অসূর্য্যম্পশ্য অবস্থায় আছেন, আমরা জানিয়াছি, তিনি পূর্ণ ভগবান। তুমি ভগবান বিশ্বাস কর আর না কর, একজন মহাপুরুষ মনে করিতে দোষ কি? অবিনাশ,—একথা একবাক্যেই স্বীকার করি। যিনি, চৌদ্দবৎসর যাবৎ একটি ক্ষুদ্র কুটীরে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বদ্ধ আছেন, তিনি যে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; ওভাবে আমরা চৌদ্দমিনিটও থাকিতে পারি না। চিকিৎসক,—তুমি মহাপুরুষ মনে করিয়াই ওখানে একটু একটু যাও, ও ভক্তি করিতে থাক, তা হইলেই কাজ হইবে। অবিনাশ,—যাঁহাকে দেখা যায় না, যিনি কথা বলেন না, কিছু লিখিয়াও জানান না, তাঁর কাছে গেলে কি ফল হইবে? আর দেখা শুনা না হইলে অনুমানে ভক্তিই বা কি করিয়া আসে? চিকিৎসক,—তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিয়া ওখানে মাঝে মাঝে যাইও, তাঁহার নামটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিও, তুমি তাঁহাকে না দেখিলেও তিনি ত তোমাকে দেখেন, দুই চারিদিন যাইয়া দেখ, বিশেষ ত কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, যাইতে দোষ কি? লাভ হইলে যথেষ্ট হইবে—"যাহা রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যেও দিতে পারে না।" অবিনাশ

অগত্যা শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর ওখানে দুই একবার যাইতে স্বীকৃত হইয়া চিকিৎসকের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া চলিয়া গেল। বিপদের সময় বাধ্য হইয়াও মানুষকে "রোগীর নিম খাওয়ার মত" চোক মুখ বুজিয়া অনেক কাজ করিতে হয়। অবিনাশ মাঝে মাঝে একটু ফাঁক পাইলেই শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গনে যাইতে ও তাঁহার নামটি প্রায় সকল সময়ই স্মরণ রাখিতে আরম্ভ করিল। অতি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই অবিনাশের জীবনে এক অমানুষিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। অবিনাশ অভূত-পূর্ব্ব কল্পনাতীত ভাব, শান্তি ও অনুভূতি লাভ করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২৫।৩০টি অভূত-পূর্ব্ব স্বপ্নে প্রাণের পূর্ণশান্তি ও আনন্দ লাভ করিল। অবিনাশ কি লাভ করিল, তাহা প্রভু জানেন, অবিনাশ জানে, পাঠক মহাশয়ও একটু অনুভব করিয়া লইবেন, আমি অতি সংক্ষেপে তাঁহার মাত্র দুই তিনটি স্বপ্নবৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

১। অবিনাশের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যখন খুব বেশী, প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু-ভয় আসিয়া বিভীষিকা দেখাইতেছিল, তখন একটি স্বপ্ন দেখিল—

প্রভুজগদ্বন্ধুর (চিত্রপটে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়) মূর্ত্তি!—একটু স্থির ভাবে দৃষ্টি করিতেই তাঁহার ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া গেল। আর সেই মূর্ত্তির সম্মুখে যম রাজা (সাধারণত চিত্রপটে যেরূপ যমের চেহারা দেখা গিয়া থাকে) করপুটে দাঁড়াইয়া কি যেন আদেশ

প্রতীক্ষা করিতেছে। শ্রীশ্রীপ্রভু যমকে কি যেন বলিয়া আদেশ দিতেছেন। অবিনাশের প্রাণে আজ অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইল! আর কিসের মৃত্যুভয়!! প্রভু আমার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!! যম যাঁহার আজ্ঞাবহ, আমি ত সেই প্রভুরই শরণাগত, তবে আর ভয় কি? আজ প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল, মৃত্যুভয় দূর হইল! সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্রোগও সারিয়া গেল। কিছুদিন পরে অবিনাশের হাম জ্বর হইল। শরীরে বড় জ্বালা হইয়াছে, সর্ব্বদাই শীতল জিনিসে অভিলাষ হইতেছে, কোথায় গেলে যে, জ্বালা জুড়াইবে তাই ভাবিয়া মনটি এক এক সময় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। রাত্রিতে আবার অদ্ভুত স্বপ্ন—

২। প্রভুর অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলের পার্শ্বদেশে কত সমুদ্র, নদী, সরোবর, সুরম্য নীলাভ জলপূর্ণ হইয়া মৃদু সমীরণে ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার উপর দিয়া অতি মনোহর একটি রক্তাভ জ্যোতি পড়িয়াছে। আহা! কি আনন্দময় অপূর্ব্ব দৃশ্য!! দেখিয়াই মনপ্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল, কি এক অপূর্ব্ব শান্তিতে হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল! আহা জীবনে ত এমন দৃশ্য দেখি নাই, এমন শান্তি কখনও অনুভব করি নাই!! কে যেন বলিল, "এখানে আসিয়া স্নান করিলে সব জ্বালা জুড়াইবে।" আহা মরি মরি আজ সিউরির পাহাড়ে বসিয়া অবিনাশ যেই সামান্য একটু হাম জ্বরের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিল, অমনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু আমার, তাহার চিরশান্তির ব্যবস্থা করিলেন, চিরজ্বালা জুড়াইবার জন্য আপনার বক্ষঃস্থ শান্তি-সরোবরে স্নানার্থে আহ্বান করিলেন। আজ

হ’তে অবিনাশের ইহপরকালের সমস্ত জ্বালা নির্ব্বাপিত হইল। এখন প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ, হৃদয়ে অপূর্ব্ব বল আসিয়াছে, অবিনাশ, প্রভুতে মনপ্রাণ বিকাইয়া ফেলিয়াছে। আজ আবার এক অদ্ভুত স্বপ্ন—

৩। অবিনাশ যেন বেড়াইতে বেড়াইতে সমুদ্রের তীরে গিয়াছে। যাইয়া দেখে এক জেলে, বহুদূর বিস্তৃত এক জাল ফে’লে অবিরত টানিতেছে। আর অনতিদূরে একটি লোক বসিয়া বসিয়া গান করিতেছে,—

“জেলে জাল ফে’লে রয়েছে ব’সে,
কি হবে মা তারা শেষে।
অগাধ সলিলে মীনের আশায়,
(জেলে) জাল ফে’লে রয়েছে ভুবনময়!
যখন যা’রে মনে করে তখন তা’রে ধরে কেশে।
পালাবার পথ নাহি এ জালে,
পালাবিরে কোথা ধরেছে যে কালে।”

এই শেষ অন্তরাটি গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ আর একটি লোক বলিয়া উঠিল—“পলাইতে পারে তাঁরা,—যাঁরা প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রিত।” বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই—জগদ্বন্ধু নামের ধ্বনি শুনিবামাত্র জাল হইতে অসংখ্য মাছ,—খৈর মত ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। জেলে অবিরত জাল টানিতেছে, এতক্ষণ একটি মাছও পলাইতে পারে নাই! মহাকাল, মায়াজাল পাতিয়া এইরূপে নর-মীনগুলিকে কাম-কামনাময় পাপের সাগরে, আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীশ্রীপ্রভু অবিনাশকে দেখাইলেন,—এবার তাঁহার মহা-উদ্ধারণ লীলায় অষ্টপাশে বদ্ধজীব, এমনি করিয়াই মায়া-জাল ছিন্ন করত কালের করাল-গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে এমনি করিয়াই শ্রীভগবান আপনার লীলা-মাহাত্ম্য ও নাম-মাহাত্ম্য অনুভব করাইয়া থাকেন! পাঠক মহাশয়! এ কি স্বপ্ন? নাকি ভবের মোহময়-স্বপ্ন ভাঙ্গিবার অপ্রাকৃত মহৌষধ !!

৪। অবিনাশ এখন মনের আনন্দে সর্ব্বদা প্রভুর নাম করিয়া অপার আনন্দে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব শান্তিতে কাল-যাপন করিতেছে। এখন প্রায়ই মনে হয়, প্রভু অবতার। প্রভু নিশ্চয়ই এবার অপূর্ব্ব লীলাতে আমাদের মত অবিশ্বাসী পাপী তাপীর উদ্ধার করিবেন। অকস্মাৎ আবার একটী স্বপ্ন—"অবিনাশের স্বর্গীয়া ঠাকুরমা আসিয়া বলিতেছেন,—'অবিনাশ! তুই আর প্রভু-জগদ্বন্ধুকে অবতার অবতার কি বলিস্? তিনি আর অবতার কি? তাঁর যে প্রধান ভক্ত, সেই যে অবতার! তাঁরই যে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিবার ক্ষমতা আছে !!' অতঃপর তিনি ও তাঁহার স্বর্গীয়া ছোট-ভগ্নী উভয়েই, এই বলিয়া একজন প্রভু-ভক্তকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, অবিনাশের পরিবারস্থ সকলেই যেন প্রভুর কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয়। পাঠক মহাশয়, ভগবানে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, স্বভাবের ভক্ত অবিনাশের স্বপ্নাবস্থায় ভগবৎ অনুভূতি দেখিলেন ত? শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইবার সময় এইরূপেই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীতে আপনার আগমন বার্ত্তা জগজ্জীবকে জানাইয়া

থাকেন। কি আশ্চর্য্য কল্পনাতীত ঘটনা! প্রভুতে কৃষ্ণ-মূর্ত্তির বিকাশ, যমরাজ তাঁহার আজ্ঞাবহ, তাঁহার মহা-নামে পাশ-মুক্তি, তাঁহার শরীরের ভিতর নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি বিশ্বরূপ !! তাঁহার প্রধান ভক্ত যে, তিনিই অবতার !! একি স্বপ্ন? এরূপ স্বপ্ন কি কেহ কল্পনাও করিতে পারে? অর্জ্জুন ভিন্নত শ্রীকৃষ্ণে এ বিশ্বরূপ আর কেহ দেখিতে পায় নাই !!

ভগবানের অষ্টম-প্রকাশ—অভক্ত পাষণ্ড হইতে।

পাঠক মহাশয়কে এখন একটি ভগবানে অবিশ্বাসী সম্পূর্ণ পাপাচারী পাষণ্ডের কথা বলিব। সে পাষণ্ড এই অধম লেখক। আশৈশবই এ অধম, ধর্ম্মে-কর্ম্মে আস্থাহীন। জীবনে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে নাই। এমন কি ক্ষুদ্র আয়তনের গীতাখানা পাঠও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। ধর্ম্ম জানি না অথচ ধর্ম্মের নিন্দা করা একটা কদভ্যাস ছিল। কৃষ্ণলীলাটি শুধু একটা ব্যভিচার বলিয়া, তীব্র ভাষায় যা তা বলিয়া অনেক ভক্তের প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়াছি। একদিন পাংশা মধ্য-ইংস্কুলের ভূত-পূর্ব্ব হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিয়রে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া বিভৎস স্বরে বলিয়াছিলাম;—"তোমরা যেমন বদমায়েশ তোমাদের মাথার কাছে চিত্রপটও রাখ তেমনি।" তিনি আমার এই কৃষ্ণনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন! আমি বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। ইহার কিছুদিন পরেই এই নাস্তিক পাষণ্ডের প্রতি,—এই জগাইর প্রতি শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দরের

অদ্ভুত কৃপা !! একেবারে ডু'বে যাচ্ছিলাম, তাই প্রভু কৃপা করিয়া অযাচিত ভাবে কেশে ধরিলেন ! অকস্মাৎ তাঁহাতে কৃষ্ণরূপ দেখাইয়া কি যেন কেমন করিয়া ফেলিলেন ! সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলা ও গৌরলীলাটি আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ দর্শনের মত বিকাশ পাইল। পূর্ব্বের কৃষ্ণনিন্দা স্মরণ করিয়া প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইলাম, প্রভু যাহা দেখাইলেন, বুঝাইলেন, অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহাই প্রকাশ করিতে লেখনী ধারণ করিলাম। কি এক কৃপা-তরঙ্গ আসিয়া আমাকে এমন করিয়া ফেলিল, বোধ হয় আট দশ দিনের ভিতরেই ব্রজলীলা ও গৌরলীলার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-তত্ত্ব-সমন্বিত এই প্রেমযোগ গ্রন্থ লেখা হইয়া গেল ! আমি কোন দিন ব্রজলীলা ও গৌরলীলা সম্বন্ধে কোন গ্রন্থই পড়ি নাই—শপথ করিয়া বলিতেছি। যিনি, আমার মত শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত কৃষ্ণনিন্দাকারীর হাতে এই প্রেম-যোগ প্রকাশ করিলেন, তিনি কে ? পাঠক মহাশয় বুঝিয়া লউন ! তানসেনের বীণা-বিনিন্দিত মধুর তানে জীব, চিরদিনই বিলাসিতার শয়নে অলসে অবশে ঘুমাইয়া পড়ে। তাই প্রভু, আজ বিশ্ব-জাগরণের জন্য—আপনার আবির্ভাব জানাইয়া জীবের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য মূকের মুখে সুখের প্রেম-সঙ্গীত প্রকাশ করিলেন। মহাউদ্ধারণ পূর্ণ-অবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু-জগদ্বন্ধুহরি এবার জগতে যে সব অদ্ভুত-লীলা করিবেন, এই প্রেম-যোগ প্রচার তাঁহারই একটি কৃপা-নিদর্শন। জগৎবাসী ! অন্যান্য অবতারে তাঁহার সামান্য দুই একটি পূর্ব্ব-সূচী দেখিতে পাইয়াছিলেন, দুই একজনের হৃদয়ে

নির্দ্দিষ্ট ভাবে ভগবানের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছিল, আর এবার অগণিত লোকের হৃদয়ে এইরূপ অদ্ভুত অনুভূতি যে তাঁহার আবির্ভাবটি অভ্রান্তরূপে জানাইয়া দিতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আসুন! আমরা বর্ত্তমান প্রেমাবতার জগতের বন্ধু শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরকে বরণ করিয়া লইতে, প্রাণ-পুষ্প-গুলিকে ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করি! তিনি আসিয়াছেন, তাঁহার মহাপ্রকাশের আর বিলম্ব নাই, শীঘ্রই সকলেরই চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে। শীঘ্রই জগৎবাসী আপন আপনটি কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া জগদ্বন্ধুর শ্রীচরণে মনপ্রাণ বিকাইয়া ধন্য হইয়া যাইবে। আজ সমস্ত সম্প্রদায়েরই প্রাণের আশা পূর্ণ হইবে। এবার তিনি একাধারেই পূর্ণলীলা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ; যদি কেহ, মনে করেন, এবার শুধু, যীশু, বা শুধু মৈত্রেয় বা শুধু গৌর আসিতেছেন, তবে তিনি ভ্রান্ত। কেন না সমস্ত সম্প্রদায় হইতে যখন একযোগে, প্রাণের সহজ-অনুভূতিতে, নিজ নিজ ইষ্ট-দেবের আবির্ভাব ঘোষিত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, এবার রাম, কৃষ্ণ, যীশু, বুদ্ধ সমস্তেরই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের জন্য একাধারে পূর্ণমিলনে শ্রীভগবান জগদ্বন্ধুরূপে, জগদ্বন্ধুনামে জগৎবাসীর প্রত্যেকের প্রাণের পিপাসা মিটাইতে আসিয়াছেন। এখানে কয়েকটি লোকের প্রত্যক্ষ-অনুভূতি মাত্র উল্লেখ করা গেল। শত শত লোকের এইরূপ অদ্ভুত দৈব-অনুভূতি উল্লেখ করিতে গেলে গ্রন্থ অতি বৃহদায়তন হইয়া যায়। সেইজন্য আর অতিরিক্ত

প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম। তবে সময়ে হয়ত আপনাদের হাতে বন্ধুর সুবিস্তৃত লীলাকাহিনী দিতে পারিব, আশা রহিল। পাঠক মহাশয়কে এখন, আপনাকে সাধারণ লেখা-পড়া জানা একজন প্রাচীন-লোকের রচিত একটি গান শুনাইয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিব। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। নিবাস বাকচড়, ফরিদপুর। গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় সামান্য কিছু লেখাপড়া অভ্যাস আছে। শ্রীশ্রীপ্রভু ছোটবেলা ইঁহাকে জ্যেঠা বলিয়া ডাকিতেন। ইনি প্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। প্রাণের আবেগে তাঁহার মুখ হইতে এই গানটি বাহির হইয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইঁহার কোন দিন কিছু লিখিবার বা রচনা করিবার অভ্যাস নাই। গানটি এই—

"জগদ্বন্ধু নাম গাও নিশিদিনে!
পূর্ণ হ'বে কাম, অন্তে মোক্ষধাম,
পাবিরে ঐ নামের গুণে।
খোল করতালে, আয় ভাই সকলে,
জগদ্বন্ধুনাম গাই প্রাণ খুলে,
জয় জগদ্বন্ধু, হা জগদ্বন্ধু,
প্রাণবন্ধু স্থান দেও চরণে॥
সত্যযুগে প্রভু নাম নারায়ণ,
ত্রেতাতে শ্রীরাম কমললোচন;
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ,
এখন জগদ্বন্ধুনাম মহা-উদ্ধারণে॥

ভক্ত লাগি প্রভু সহেন কত তাপ,
আদরে কারে বা বলেন খুড়ো বাপ ;
(আবার) অভক্ত পাষণ্ড, তাও করে না দণ্ড,
জ্যেঠা ব'লে তারে বাড়ান সম্মানে ॥
মায়াপুর হ'তে এসে নবদ্বীপে,
জগাই মাধাইর কৃপা কৈলে আচম্বিতে,
(এবার) মুর্শিধাবাদ* হ'তে এসে বাক চড়েতে,
রাধাকান্ত সুতে† রাখিলে চরণে ॥"

পাঠক মহাশয়! দেখুন, কোন দিন, যিনি কবিতা লিখেন নাই বা গান রচনা করেন নাই, তাঁহার প্রভু-সম্বন্ধে প্রাণের মহান অনুভূতিটি কি আবেগ ভরে, মধুর হইতেও মধুরতম ভাবে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! প্রভুতে ইনি অভ্রান্তরূপে রাম, কৃষ্ণ ও গৌরের সম্মিলিত মহা-মাধুরী অবলোকন করিয়া আবেগ ভরে গাহিলেন,—

"সত্যযুগে প্রভু নাম নারায়ণ,
ত্রেতাতে শ্রীরাম কমললোচন,
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ,
(এখন) জগদ্বন্ধুনাম মহাউদ্ধারণে।"

অন্তরঙ্গ ভক্তের ঠিক উপযুক্ত অনুভূতিই বটে। ভক্তের কাছে ভগবান যুগে যুগে এমনি করিয়াই প্রকাশ হ'ন বটে। এই সমস্ত ভক্তানুভূতি ব্যতীত পাঠক মহাশয় আর একটি

* প্রভু জগদ্বন্ধুর জন্মস্থান মুর্শিধাবাদ ডাহাপাড়া।

† গোপালচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পিতার নাম রাধাকান্ত।

আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখুন ;—ঐ যে শুদ্ধা-তাপসীর ন্যায় পবিত্রতার আধার বৃদ্ধা-দিগম্বরী ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীপ্রভুকে দুই তিন বৎসর বয়স হইতে বুকে করিয়া লালন পালন করিয়াছেন, আজ বৃদ্ধবয়সে তিনিও, প্রভুজগদ্বন্ধুকে পূর্ণভগবান জানিয়া, পূজা করিতেছেন! আজ তিনি, প্রভুর ফটো, তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রসাদ খাইয়া থাকেন!! ইঁহার সাধন-ভজন সবই একমাত্র জগদ্বন্ধু। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীশ্রীপ্রভুর একখানি লকেট ফটো অবিরত প্রীতি ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে!! আর কোন যুগে এমন করিয়া যশোমতী বা সচীমাতাকে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ধন্য করেন নাই! সে সব অবতারে তাঁহারা যোগমায়ার আবরণে বাৎসল্যরসেরই অভিনয় করিয়াছেন মাত্র। এবার পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন! ভক্তির মধুরতায় পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিয়াছেন! এবার নবযুগে, সবই নূতনের খেলা হইবে। সবই নূতন নূতন তত্ত্বে ও নূতন নূতন রসে অভিনব শোভায় শোভিত হইবে। এবার মহাউদ্ধারণের মহালীলায় সমস্ত জগৎ, প্রেম ও শান্তিময় হইয়া যাইবে। অতীতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠদান নবীনের হস্তে উপহার দিয়া প্রাচীন জগৎ কালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। নবীন-নাগর জগদ্বন্ধুসুন্দর নবীন আলোকে, দ্যুলোকে ভূলোকে নবীন ভাবমাধুরী প্রেমলহরী প্লাবিত করিয়া বিশ্ববাসীর হৃদয়মন্দিরে চির প্রতিষ্ঠিত হইবেন। পাঠক মহাশয়! যে দিদিমা, প্রভুকে শৈশব হইতে বুকে করিয়া পালন করিয়াছেন, আজ তাঁহার এই পূজা-ভক্তি

কি পূর্ণ ভগবত্তার পরিচায়ক নহে? মানব সম্বন্ধে কি এমন ব্যবহার সম্ভবে? জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় মহাউদ্ধারণ লীলা!!

মহাবতারণ।

এ পর্য্যন্ত অবতার সম্বন্ধে সমস্ত সম্প্রদায়ের মত, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ, ও ভক্তগণের প্রত্যক্ষ দৈব-অনুভূতি উল্লেখ করিয়া দেখান হইল। এখন পূর্ণাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু-জগদ্বন্ধু হরি, আপনার মহাউদ্ধারণ লীলা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহাই পাঠক মহাশয়কে দেখাইব। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমি ভগবান, গৌরাঙ্গসুন্দর ও আবেশে আপনাকে ভগবান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান মহাবতারী, জীবকে ধরা দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত, এবার শুধু মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, হাতে কলমে ধরা দিয়াছেন। আপনার আত্মপরিচয় লিখিয়া নিজে গ্রন্থাকারে পর্য্যন্ত জগজ্জীবের হাতে দিয়াছেন। পাঠক মহাশয় বলুন দেখি, আর কোন যুগে কোন অবতারে, জীবকে এমন করিয়া হাতে কলমে ধরা দিয়াছেন কি? আজ মায়ামুগ্ধ আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। ধরিতে পারিব না, তাই অযাচিত-কৃপায় জগৎবাসীকে যাচিয়া যাচিয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করাইতেছেন!! যে কোন প্রকারে আপনার মহানাম ও মহাউদ্ধারণ-লীলা জীবের গোচরীভূত করিয়া তাহাদের অষ্টপাশ-মুক্তির উপায় করিয়া দিতেছেন। গৌর, জীব-উদ্ধারণে আসিয়াও প্রথমতঃ আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; আর এবার মহাউদ্ধারণ প্রভু, অযাচিতভাবে অনন্ত করুণায় জীবের ঘরে ঘরে

আপনাকে যাচিয়া যাচিয়া দিতেছেন !! ধন্য প্রেমময়ের অহেতুক কৃপা !! পাঠক মহাশয়ের সম্মুখে আমরা ক্রমে সে সব উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। এই দেখুন,—রমেশ বাবু প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রবীণ ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীপ্রভু স্বহস্তে যে আত্ম-পরিচয় লিখিয়া দিয়াছিলেন, প্রভুর শ্রীহস্তের সেই আত্ম-পরিচয়ের অবিকল ব্লক নিম্নে দেওয়া গেল।—

আত্ম-পরিচয়

শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধুর স্বহস্তে লিখিত
পরিচয়ের অবিকল ব্লক্।

পাঠক মহাশয় এই দেখুন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু আপনাকে "হরি-মহাবতারণ" "মহাউদ্ধারণ" বলিয়া স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। মহাবতারী গোলোকবিহারী শ্রীহরি যে এবার জগদ্বন্ধুরূপে পতিত-জগতের মহাউদ্ধারণে আসিয়াছেন, তাহা প্রভু নিজেই জগৎবাসীকে হাতে কমলে লিখিয়া জানাইতেছেন !!

ইতিপূর্ব্বে আবেশে, স্বপ্নে নানা প্রকার দৈব-নির্দ্দেশ অনুসারে অজ্ঞাতকুলশীল ভক্ত, অভক্ত, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, পাপী ও মহাপুরুষের দৈব-অনুভূতির উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বহস্তলিখিত আত্মপরিচয় উল্লেখ করিয়া দেখান হইল। এবার ভক্তের কথার সহিত ভগবানের কথা মিলিয়া গিয়াছে, ভক্তের দৈববাণীর সহিত ভগবানের আত্ম-পরিচয় এক হইয়া বিশ্ববাসীকে তাঁহার শুভাগমন অভ্রান্তরূপে জানাইয়া দিতেছে। এবার জয় জয়কার! সকলেই প্রাণ ভরিয়া মহাবতারী জগদ্বন্ধুহরির জয় গান কর। প্রেমানন্দে নেচে নেচে গাও—"জয় জগদ্বন্ধু হরি।" এখনও যদি প্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে কাহারও অবিশ্বাস থাকে, তবে তিনি নিজেই অবিশ্বাসী, নিজেই নিজকে বিশ্বাস করেন না, বুঝিতে হইবে। যে নিজকে বিশ্বাস করে না, সে জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করে না; অবশেষে সে অবিশ্বাস, ভগবানে পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া নাস্তিক হইয়া বসে।

পাঠক মহাশয় আস্তিকই হন, আর নাস্তিকই হন, আসুন, দেখুন প্রভু আপনার পরিচয় সম্বন্ধে আরও কি জানাইতেছেন! আপনি নাস্তিক হইলেও ত "নাস্তি" কখনও

চান না, সর্ব্বদাই ত কামিনী কাঞ্চনের—বিষয় পরিজনের অস্তিত্বের ভিতর দিয়াই ছুটিতেছেন। ধন-জন কোথায় অস্তি, সুখ-শান্তি কোথায় অস্তি, তাহারইত, অনুসন্ধানে লিপ্ত আছেন, সর্ব্বদাই যখন অস্তিত্বের ভিতরেই ডুবিয়া আছেন, তখন আপনি নাস্তিক হইলেও শ্রীশ্রীপ্রভুর অবতারের অস্তিত্বটা আপনার নিকট উপস্থিত করিতে আমার অধিকার আছে। এই দেখুন অপার করুণাময় প্রভু। জগজ্জীবের প্রতি করুণা করিয়া আত্ম-পরিচয়টি গ্রন্থাকারে ছাপাইয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। চন্দ্রপাত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।'

(প্রভু প্রভু প্রভুহে) (অনন্তানন্তময়)।

প্রভুজগদ্বন্ধু এইবার আরও স্পষ্টাক্ষরে দৃঢ়তা সহকারে আপনাকে 'অনন্তানন্তময়' 'মহাউদ্ধারণ' 'হরিপুরুষ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন !! ধন্য কলিযুগ, ধন্য কলির জীব, ধন্য জগৎবাসী। আজ তোমরা অনন্তানন্তময় শ্রীহরির চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণ জুড়াইবে !! আজ সকলে প্রেমানন্দে মাতিয়া প্রেমময়ের সেবায় মানব জীবন ধন্য করিয়া লইবে। পাঠক মহাশয় ! আপনি কি এখনও প্রভুকে একজন সাধু-সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষ বলিতে চান ? এত সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়াও যদি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তবে একটু বুঝিয়া দেখিবেন,—কোন মহাপুরুষ কি আপনাকে "আমিই শ্রীহরি, আমিই অনন্তানন্তময় ভগবান" বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন ? সাধু-সন্ন্যাসী যত বড়ই হউন না কেন, বেশী হয়ত, তিনি,

আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া মনে করিতে পারেন। আমিই ভগবান বলিয়া জীব কখনও ভগবানের আসনে বসিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন আমি ভগবান; তৎপর পাঁচ হাজার বৎসর চলিয়া গেল ইহার মধ্যে এক শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কেহ "আমি ভগবান" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কি? ভগবানই আপনাকে ভগবান বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন, জীবে পারে না। এবার শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দর, শুধু—মুখেই বলেন নাই, আপনার হাতে পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়াছেন! এপর্য্যন্ত যত অবতার ও অবতারী আসিয়াছেন, প্রভুজগদ্বন্ধু ব্যতীত আর কেহ আপনাকে অনন্তানন্তময় শ্রীহরি বলিয়া এমন ভাবে হাতে কলমে লিখিয়া ধরা দেন নাই। এবার মায়ামুগ্ধ জীবকে ধরা দিবার জন্য আসিয়াছেন, উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন,জীবত্বের অন্ধতায় আমরা তাঁহাকে ধরিতে ও বুঝিতে পারিব না বলিয়াই, আপনি আপনাকে এরূপ অযাচিত কৃপায় যাচিয়া যাচিয়া দিতেছেন, সকলকেই আত্মতত্ত্ব ও আত্মপরিচয় জানাইতেছেন!!

পাঠক মহাশয়! নিশ্চয় জানিবেন,—যদি কেহ আপনাকে ভগবান বলিয়া জগতে ঘোষণা করেন, তবে হয় তিনি নিশ্চয়ই ভগবান, আর না হয় ত পাগল। প্রভু-জগদ্বন্ধুতে আশৈশব যে অপ্রাকৃত ভাব বর্ত্তমান, তিনি যে প্রতিকার্য্যে, প্রতিবাক্যে, প্রত্যেক ব্যবহারে আপনার পূর্ণভগবৎ-শক্তিরই পূর্ণমাত্রায় পরিচয় দিয়া আসিতেছেন; তাঁহার অপ্রাকৃত অমানুষিক ভাব-রাশি যে, জীবজগতের অতীত, সাধু-সন্ন্যাসীর অতীত, সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ ঐশীশক্তিসম্পন্ন তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যতই দিনের পর দিন যাইতেছে, ততই তাঁহার আত্ম পরিচয়টি পূর্ণমাত্রায় সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে, ততই নানা সম্প্রদায়ের ভক্ত ও অভক্তগণের আশ্চর্য্য দৈব-অনুভূতিতে শ্রীশ্রীপ্রভুর পূর্ণ-ভগবত্তা একেবারে অভ্রান্ত ও অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এখন শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীমুখে আপনার তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই দেখাইতেছি।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাস নামক একজন চিরকুমার ত্যাগী ভক্তকে শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"অনাদির আদি গোবিন্দ—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীগৌরাঙ্গ। এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা, এই দুই লীলার সর্ব্বসমষ্টিশক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু ; তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগবন্ধু। আমি সেই রে, আমি সেই জান্‌লি ?

"THE LILA COMBINATION OF ALL THINGS."

শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জান্‌বি কি ? তাঁহার নিজের ইচ্ছা। যখন আসিবার প্রয়োজন হয়, তখনই আসেন। লক্ষণে চিন্‌বি, শক্তি প্রকাশ কর্‌লে এবং জগৎকে জানাইলে জগৎ জানিতে পারে। আমার আগমনে জগতে সকল সাধু মহাপুরুষের আগমন, আমি সকলের কেন্দ্র। অনেক ভক্ত, অভিমানে অবতার সাজিয়া বসিবে। সাবধান,

সকলকে নিষেধ করিয়া দিস্, যেন কেঁহ নিতাই, অদ্বৈত প্রভৃতি না সাজে; এবার আমার একাধারেই সব।"

পাঠক মহাশয়, দেখিলেন ত? জগতের যাবতীয় সম্প্রদায় যেমন, নিজ নিজ পরিত্রাতার আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছেন, শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু তেমন ইহার প্রায় বার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বেই আপনার একাধারে সর্ব্বসমষ্টি বলিয়া জগৎবাসীকে জানাইয়াছেন। এস জগৎবাসী! আজ জগতের পরিত্রাণের জন্য অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান্ জগদ্বন্ধু আবির্ভূত হইয়াছেন, পাপী হও, তাপী হও, যে হও "জয় জগবন্ধু" বলিয়া শীঘ্র ছুটিয়া এস, আজ ভূলোকেই গোলোকবিহারী শ্রীহরির চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণ শীতল কর। আর এমন দিন হইবে না, আর কোন যুগে এমন একাধারে পূর্ণলীলা প্রকটন হয় নাই। কৃষ্ণ, আসিয়াছেন, রাধা আসিয়াছেন, একত্র সম্মিলনে গৌর আসিয়াছেন, কৃষ্ণলীলা হইয়া গিয়াছে, গৌরলীলা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু একাধারে গৌর-কৃষ্ণ, একাধারে সমবায় ব্রজলীলা ও গৌর-লীলা, আর কখনও হয় নাই। একাধারে রাধাকৃষ্ণ, নিতাই-গৌর, বিষ্ণু, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ আর কখনও আসেন নাই। এবার যেমন জগৎময় মহাপ্রলয়, তেমন একাধারে জগজ্জীবের পরিত্রাতা জগদ্বন্ধুর উদয়!! আবার শুনুন, শ্রীশ্রীপ্রভু, প্রিয়ভক্ত রমেশ বাবুকে কি বলিয়াছিলেন,—

"দেখ্ রমেশ! ব্রজলীলায় প্রেম-রসাস্বাদন করিয়াছিল অষ্ট-সখী। গৌরলীলায় রসপাত্র ছিল—সাড়ে তিন জন! ওসব লীলায় বিশেষ কিছু হয় নাই; এবার বিশ্বের প্রত্যেক

পরমাণুকে আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু !!”

মাভৈ ! মাভৈ ! এবার জগজ্জীবের আর ভয় নাই ! এবার কেহই তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হইবে না !, সকলেই প্রেমময়ের প্রেমরসাস্বাদনে ধন্য হইবে !! এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—প্রত্যেক পরমাণুকে পর্য্যন্ত আপনার স্বরূপ আস্বাদন করাইবেন ! ধন্য প্রেমময়ের অযাচিত প্রেম, ধন্য মহাউদ্ধারণ প্রেম-লীলা !! এবার প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম-পারাবার উদ্বেলিত হইয়া, একেবারে অণুপরমাণুকে পর্য্যন্ত ধন্য করিতে,—স্বরূপ আস্বাদন করাইতে অনন্ত প্রবাহ তুলিয়া জগৎ ভাসাইতে ছুটিয়াছে ! ধন্য জগজ্জীবের বন্ধু ! ধন্য মহাউদ্ধারণ প্রেমাবতার জগদ্বন্ধু !! এবার তোমার কৃপায় পরমাণুটি পর্য্যন্তও প্রেমের প্লাবনে ধন্য হইয়া যাইবে !! কিন্তু ভাই ! একটি কথা,—তিনি ত, জীবের জন্যই আসিয়াছেন, জীবকে কৃপা করিবেন, উদ্ধার করিবেন, প্রেম দিবেন, ভক্তি দিবেন, পরমাণুকে পর্য্যন্তও স্বরূপ আস্বাদন করাইবেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি জীবের কি কোন কর্ত্তব্য নাই ? প্রেমিকে প্রেমাস্পদে, ভক্তে ভগবানে, পরস্পর সম্মিলন না হইলে, ভাবে, রাগে, রসে পরস্পর প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, সুখ কি, শান্তি কৈ ? পিতা পুত্রে, পতি পত্নীতে, পরস্পর ভালবাসাতে সুখের তরঙ্গ। পতি, পত্নীকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিবেন, আর পত্নী, তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিবেন না, এ

ভাবের ভিতরে প্রেম কৈ ? সুখ শান্তি কৈ ? আনন্দ কৈ ? তৃপ্তি কৈ ? সেই জন্য বলি, ভাই তিনি ত উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন,—উদ্ধার করিবেন, দয়া করিবেন, কিন্তু তাহাতে তোমার প্রাণের সে পরিতৃপ্তি কৈ ? গোপীদের মত দিবানিশি. প্রেমাবেশে অলসে অবশে রসাবেশে ঢল ঢল অবস্থা কৈ ? সে সুখ শান্তি কৈ ? প্রেমানন্দে মাতামাতি কৈ ? ভগবান আসিলেন, জীব-উদ্ধার করিয়া চলিয়া গেলেন, আমি যদি একবারও সে প্রেমের ছবি না দেখিলাম, সে হৃদয়বল্লভকে হৃদয়ে তুলিয়া না লইলাম, সাক্ষাতে পাইয়াও দুটি প্রাণের কথা না বলিলাম, না শুনিলাম, কাছে পাইয়াও প্রাণেশকে প্রাণ দিয়া ভাল না বাসিলাম, সেবা না করিলাম, তবে, হইল কি ? পাইলাম কি ? করিলাম কি ? তিনি আসিলেন, আমি তাঁর দিকে চাহিলাম না, দেখিলাম না, সেবা করিলাম না, তিনি উদ্ধার করিয়া, পাপতাপ হইতে মুক্ত করিয়া প্রেম-ভক্তি দিয়া আপনার স্বরূপ জানাইয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিভোর হইলাম কৈ ? গোপীদের মত, গৌর-পরিকরদিগের মত তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার হইলাম কৈ ? তাঁহার হইয়া তাঁহার প্রেমের, সেবায় জীবন-মন চরিতার্থ করিলাম কৈ ? প্রেমানন্দে হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া গাহিয়া প্রাণেশের শ্রীচরণ বুকে তুলিয়া লইলাম কৈ ? হৃদয় নিধিকে হৃদয়ে তুলিয়া প্রেমালিঙ্গনে ধন্য হইলাম কৈ ?

এস জগৎবাসী ! আর ঘুমাইও না, এবার দুঃখের নিশি অবসান হইয়াছে, প্রাণবল্লভ, তোমাদের প্রাণ-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ

করিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উঠ! জাগ! আর ঘুমাইও না, এমন দিন আর পাইবে না, এমন ভাগ্য আর হইবে না, এস, জয় জগদ্বন্ধু বলিয়া ছুটিয়া গিয়া প্রাণবল্লভের প্রেমের বুকে ঝাঁপিয়া পড়! বহুদিন, কীর্ত্তনে আনন্দ পাইয়াছ, নিবেদন করিয়া প্রসাদ খাইয়া আনন্দ পাইয়াছ, এবার নামী উপস্থিত, শুধু নামে আনন্দ না পাইয়া, আনন্দময়কে প্রেমের বুকে তুলিয়া লইয়া চিরতাপ-দগ্ধ প্রাণ সুশীতল কর, এবার শুধু নিবেদিত প্রসাদে আনন্দ না পাইয়া, প্রাণ দিয়া প্রেমময়ের সাক্ষাৎ-সেবা করিয়া ধন্য হও, হাতে তুলিয়া মুখে দাও, যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি দান কর! জীবন ধন্য হউক, মরদেহেই দেবদুর্ল্লভ শান্তি-সুখে দেহ, মন, প্রাণ চরিতার্থ কর। এতদিন ভগবান 'শব্দটি' শুনিয়াছ, এবার দেখিয়া, তাঁহাকে তাঁহার চরণরেণু লইয়া, সেবা করিয়া ভূলোকেই গোলোকবাস কর। প্রেমানন্দে বিভোর হও।

ভাই! তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বর হইয়াও আজ জীবের দুঃখে জীবের বেশে আসিয়া তোমাদের দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি ধন চাহেন না, মান চাহেন না, চাহেন শুধু প্রাণ! চাহেন শুধু প্রাণ-মাতান হরিনাম, ঐ যে প্রভু বলিতেছেন,—

"আমি কি তোদের কেউ নই! আমি কি ভেসেই যাব? আমায় কি হরিনাম দিয়ে কেউ রক্ষা করবে না? আমি তোমাদের দেহ, মন, প্রাণ সব। তোমরা আমার কথা রাখ, হরিনাম কর। আমি তাই শুন্‌তে শুন্‌তে ধূলিতে—পৃথিবীর

সমস্তে—আকাশে মিশিয়া যাই! আমার শপথ, তোমরা হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক, তোমাদেরও মঙ্গল হউক, তাহলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। তোমরা হরিনাম ক'রে, আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশাইয়া লও। আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর এই মহা বাক্যেই তাঁহার ভাবীলীলা সূচনা করিয়া দিতেছে। তিনি যে শুধু হরিনামের, হরিনামেই যে তাঁহার একমাত্র তৃপ্তি, জগতের সবাই হরিনামে মত্ত হইলেই যে তাঁহার ভবধামের লীলা শেষ হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লেখ করিয়াছেন। আহা! প্রভু আমার, হরিনামবিহীন, পতিত জগতে নাম বিলাইতে আসিয়া কাতর প্রাণে জীবকে বলিতেছেন,—"আমি কি তোদের কেউ নই! আমি কি ভেসেই যাব!! আমায় কি হরিনাম দিয়ে কেউ রক্ষা করবে না!!!" আহা মরি মরি! প্রভু আমার, পতিত জীবকে, হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিতে কত ব্যস্ত! কত ব্যাকুল!! জীবকে আকুলপ্রাণে কতদুঃখে বলিতেছেন, আমি কি ভেসেই যাব? আমাকে কি হরিনাম দিয়া কেউ রক্ষা ক'রবে না!! আহা জীবকে হরিনাম করাইতে কত কাতরতা! কত ব্যাকুলতা! কত দায় ঠেকিয়া, কত বিপদে পড়িয়া যেন জীবের মুখে হরিনাম শুনিতে চেষ্টা পাইতেছেন!! বলিতেছেন:—"তোরা হরিনাম কর, তাই শুনতে শুনতে, ধূলিতে, পৃথিবীর সমস্তে, আকাশে মিশিয়া যাই!" আহা ইহাই মহাউদ্ধারণের মহাভাব!! ইহাই শ্রীশ্রীহরিপুরুষের হরিরস, রাসরস—বিশ্বজনীন অনন্ত-প্রেম!

যুগল মাধুরী!! এ মহাভাব, এ মহারাসরস বুঝিবে কে? আস্বাদন করিবে কে? ইহাতে ডুবিবে কে? হরি, নিজে সেই মহাভাবে, মহারসে, ধূলিতে,—পৃথিবীর সমস্তে—আকাশে মিলাইয়া যাইতেছেন!! এ মহাভাবে, পূর্ণপ্রেমময় শ্রীহরি ভিন্ন জীবের অধিকার কোথায়? সাধক, সিদ্ধের অধিকার কোথায়!! 'এ' ভাবের মানুষ—ব্রজগোপী! এ ভাবের ভাবুক—নিতাই গৌর, তাহা ছাড়া, প্রাকৃত-জগতে এ অপ্রাকৃত প্রেমের মহাভাব, এ অনন্তানন্তময়-তন্ময়তা, কে বুঝিবে, কেমন করিয়া বুঝিবে? জয় জগদ্বন্ধু হরি!! জয় তোমার প্রেমের মহাভাব! ভাবের কাছে, ভাষা চির দিনই পরাস্ত! ভাবের কাছে, ভাষা চিরদিনই কাঙ্গাল!! তোমার বিশ্বব্যাপী অনন্ত প্রেমের, মহাভা আমাদের জীব-ভাবে ও জীব-ভাষায় কি বা বুঝিব, কি বা লিখিব! তাই পরাস্ত হইয়া শুধু কাতর প্রাণে বলিতে চাই!—

"তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহী-মণ্ডলে!!
সৌরভে বা গৌরবে, কে তব সদৃশ ভবে,
এ কেবল তোমায় সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজা, গঙ্গাজলে!!

যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে, তেমন, তোমার মহাভাবময়ী প্রেমময়ী রাধা ভিন্ন—গোপী ভিন্ন, সে মহাভাব ভিন্ন, এ অনন্তানন্তময় মহা মহা ভাবময় রসের প্লাবন আর কে অনুভব করিবে! সে ভাবময়ীরা ভিন্ন, সে ভাবময়-গৌর পরিকর ভিন্ন তোমার এ মহাভাবের মহাপূজা আর কে বুঝিবে, আর কে করিবে, এ কেবল তোমায় সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে!! জীব,

এঅপ্রাকৃত মহাভাব কি করিয়া বুঝিবে !! কেমন করিয়া জানিবে !! আহা ভাবের তরঙ্গে বিভোর হইয়া প্রভু ঐ আবার মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছেন,—"আমার শপথ তোমরা হরিনাম কর, তবেই আমার ভবধামের লীলা শেষ হয়।"

প্রভো ! আমরা বহির্ম্মুখ জীব ! বহুদিবস তোমাকে ভুলিয়া, মায়ার কুহকে মজিয়া, পাপেতাপে জীবন বিকাইয়াছি, তোমাকে ভুলিয়াছি,—একেবারেই হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি, তোমার 'শপথ' রক্ষা করিবার কি আর অবস্থা আছে ? তোমার দিকে চাহিবার কি আর চক্ষু আছে ? তোমার ভাব ও ভাষা বুঝিবার কি শক্তি আছে ? আমাদের যদি বিন্দুমাত্রও প্রাণ থাকিত, হৃদয় থাকিত, তবে তোমার ভাব বুঝিতাম, ভাষা বুঝিতাম, তোমার দিকে চাহিয়া তোমার এই অনন্ত জীব-দুঃখ-কাতরতা দেখিয়া প্রাণে ব্যথা পাইতাম, তোমার হইতাম, তোমার হইয়া তোমার আকুল প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া করুণকণ্ঠে নিতাইয়ের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবের কাছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া, হাতে পায় ধরিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া বলিতাম—"ও ভাই বল হরি বল, মোরে কররে শীতল, বিনামূলে বিকাইব ভজ,—জগদ্বন্ধু চাঁদ রে !!" উঃ কি জীব-দুঃখ কাতরতা ! জীবকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিবার জন্য প্রভু, কাঁদিয়া কাঁদিয়া 'শপথ' পর্য্যন্ত করিতেছেন !! আর আমরা পাপে তাপে ডুবিয়া কামিনী-কাঞ্চনের মোহ মদিরায় মাতাল হইয়া নরক অভিনয় করিতেছি !! ধিক্ আমাদের প্রাণে, ধিক্ আমাদের মানুষ অভিমানে !!

ভ্রাতৃগণ! এস! ঐ যে, প্রভো কাতর প্রাণে! আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, 'আমার শপথ' বলিয়া মাথার দিব্যি দিয়া হরিনাম করিতে বলিতেছেন, এস! আর ঘুমাইও না; মহা-উদ্ধারণের আকুল প্রাণের এই ঐকান্তিক মহা আহ্বান হইতে কেহ আর দূরে থাকিও না; প্রাণ ভরিয়া সকলে মিলিয়া গাও—জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় জগদ্বন্ধু হরি!! আমরা হরিনামে মত্ত হইলেই, প্রভু আনন্দে ভাসিবেন,—তাঁহার ভবধামের মহাউদ্ধারণ-লীলা শেষ হইবে। এখানে পরমহংস-সচ্চিদানন্দের কথাটি প্রভুর বাক্যের সহিত, একেবারে মিলিয়া গিয়াছে,—

"জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু শ্রীহরিপুরুষ,
প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-বন্যা বেশে
ভাসাইবে ত্রিজগত; * * স্থাবর জঙ্গম।"

প্রভু জগৎবাসীকে মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়াছেন,—তোমরা হরিনাম করিলেই আমার ভবধামের লীলা শেষ হয়, আবার ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ-মহাপুরুষ পরমহংসদেব ও আপনার ভাবে ডুবিয়া জগৎবাসীকে জানাইয়াছেন, এবার হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু গৌর-প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইবেন। গৌর, যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, নবদ্বীপে আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, এবার মহাউদ্ধারণ-জগদ্বন্ধু সেই হরিনামে রাধা প্রেমে ত্রিজগৎ ভাসাইবেন। স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্তও নামে প্রেমে মত্ত হইবে। গৌরের প্রেম-মন্দাকিনী ধারা এবার মহার্ণবে পরিণত হইয়া মহাবিশ্বকে ভাসাইবে। জগদ্বন্ধু এবার

হরিনামে বিশ্ব প্লাবিত করিবেন! কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সর্ব্ব সম্প্রদায় হরিনামে মত্ত হইবে। হরিনামে ধরা টলমল করিবে।

প্রভু বলিতেছেন, "আমি হরিনামের—এ ভিন্ন আর কারো নই।" পাঠক মহাশয়! শ্রীগৌরাঙ্গের পর আর এমন কথা কেহ বলিয়াছেন কি? হরিনামে,আর কেহ আপনা বিকাইয়াছেন কি? সাধু সন্ন্যাসীর মুখে কি এমন বিশ্ব-পরিত্রাণের মহাভাষা বাহির হইতে পারে? শ্রীহরি জীব-উদ্ধারণে আসিয়া জীবের কাছে আর কিছু চাহেন না, কেবল হরিনামেই আপনাকে বিকাইতে চাহেন।—তাই প্রভু শ্রীমতী সঙ্কীর্ত্তনে লিখিয়াছেন,—

"হরিব'লে বিনামূলে, কিনে লহ রে আমায়।"

এস ভাই! আমরা হরিনাম করিয়া মহাবতারী প্রেমময় জগদ্বন্ধু-হরিকে আপনার করিয়া লই; তাঁহার ভবধামের লীলা উদ্‌যাপনে প্রেমানন্দে ডুবিয়া যাই।

প্রভু, বহির্ম্মুখ জীবের দুর্গতি দেখিয়া আবার প্রেম-বিগলিত-কণ্ঠে বলিয়াছেন, "তোমাদের গতি অহং। আমি ভিন্ন একূলে ওকূলে তোদের আর কেউ নাই! আমি চিরকাল তোদিগকে রক্ষা কর্‌বো।" তোরা আমায় স্মরণ করিস্ আর না করিস্ আমি তোদিগকে স্মরণ ক'রব!! আহা কি বিশ্বপ্রেম-বিগলিত মহাভাব!! কি মহাপ্রাণতা!! কি জীবদুঃখ কাতরতা!! আহা! পতিতপাবন মহাউদ্ধারণ—জীবকে কি অভয়ই দিয়াছেন!! "তোরা আমায় স্মরণ করিস্ আর না করিস্ আমি তোদিগকে

স্মরণ ক'রব !!" প্রভো ! হা—অনাথশরণ ! তুমি ত অনন্ত-কালই একমাত্র গতি, একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ! তাই যুগে যুগেই জীবের দুর্গতি দেখিলে,—প্রেম-বিগলিত-হৃদয়ে কোলে তুলিয়া লইতে আস, চিরদিনই জীব তোমায় স্মরণ করুক আর না করুক, তুমি জীবকে প্রেমের বুকে করিয়া রাখিয়াছ !! কিন্তু আমরা জীব তোমার দিকে ফিরিয়া চাই কৈ ? তোমার কথা স্মরণ করি কৈ ?

প্রভু আবার বলিতেছেন,—

"আমি একক সর্ব্বসমষ্টি। আমি ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া একাই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব।" এবার ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু পূর্ণ-ভগবান জগবন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন,—আমি একাই ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' করিব। বাস্তবিক তিনি ভিন্ন তাঁহার কীর্ত্তন জগৎ ভরিয়া আর কে ছড়াইতে পারে ? গৌর আসিয়াছিলেন, তখন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলে হরিনামে পাগল হইয়া গিয়াছিল। এবার আবার তিনি যে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া নাম বিলাইবেন, তাহার সূচনা, আমরা পূর্ব্ব হইতেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি। যতই দিন চলিয়া যাইতেছে, যতই শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাপ্রকাশের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই চারিদিকে হরিনামের রোল উঠিতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে, হরিনামমাত্র ছিল না, ভগবৎপ্রসঙ্গ ভুলেও উঠিত না, সেখানেও আজ শুভ সূচনা দেখা যাইতেছে, হরিনামের স্রোত আবার প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র স্রোত, মহাউদ্ধারণের মহালীলায়

অচিরেই যে, মহার্ণবে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবার ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু, ব্রহ্মাণ্ডময় 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' করিতে আসিয়াছেন, তাই, সর্ব্বত্রই হরিনামের রোল দিন দিনই উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আজকাল অনেক স্থানেই হরিসভা, হরিনাম কীর্ত্তন, অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন, সপ্তাহব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন, পক্ষব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন, মাসব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন হইয়া,মহাউদ্ধারণের কার্য্যারম্ভের সূচনা জ্ঞাপন করিতেছে. আবার দেখুন—ভাবী লীলার আভাস দিয়া প্রভু কয়েকটি ভক্তকে বলিয়াছিলেন,—"দেখ্‌বি এমন দিন আস্‌বে যেসময় একটি কথা শুনিবার জন্য কাঁদ্‌বি ; তখন খুঁজেও পাবি না ! লক্ষ লক্ষ. লোক আমায় ঘিরে থাক্‌বে ; হরিনামে, প্রেমে ধরা টলমল কর্‌বে। মনে রাখিস্---আমার হাত কেউ এড়া'তে পার্‌বে না।"

প্রভু বলিতেছেন,—"আমার হাত কেউ এড়াতে পার্‌বে না ; হরিনামে প্রেমে ধরা টলমল কর্‌বে।" এইখানেই আমরা এবার প্রভুর ভাবী লীলাটি স্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে স্বরূপ-আস্বাদন করাইব তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু" ! তৎপর বলিয়াছেন,— "আমি ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া একই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব"। এবার আবার বিশেষ করিয়া বলিলেন—"আমার হাত কেউ এড়া'তে পার্‌বে না, হরিনামে প্রেমে ধরা টলমল কর্‌বে।" বটে, মহাউদ্ধারণের মহাবাণীই বটে, জীবউদ্ধারণের মহা-প্রেমের প্লাবনই বটে। সাধু মহাপুরুষ দূরে থাকুক্, গৌরও

এমন দৃঢ়তার সহিত বিশ্ব-উদ্ধারণের অভয়বাণী শুনান নাই ;—"এবার আমার হাত কেউ এড়াতে পার্‌বে না, পরমাণুকে পর্য্যন্তও আমার স্বরূপ-আস্বাদন করাইব !" জয় জগদ্বন্ধু-হরি ! জয় মহাউদ্ধারণ-লীলা ! তোমার এ অনন্তানন্তময় মহাভাবের নিকট আমাদের ক্ষুদ্র-প্রাণ পরাভব মানিয়া যায় ; ইহার বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারে না। তবে আজ তোমার শ্রীমুখের এই ভবিষ্যদ্বাণী কয়েকটিতে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতেছি,—এবার বর্ত্তমান মহাউদ্ধারণলীলাটিতে হরিনামে ও রাধাপ্রেমে জগত প্লাবিত হইবে। এবার কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই হরিনামে, রাধাপ্রেমে ভরপূর হইবে, কেউ বাকী থাক্‌বে না। কেউ তোমার হাত এড়াইতে পারিবে না। পাঠক মহাশয়, শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিলেন ত, এমন বিশ্ব-উদ্ধারণের ভাষা ভগবানের অভয়বাণী নয় কি ? সাধক হউক, সিদ্ধ হউক, মহাপুরুষ হউক, জীবের মুখে কি কখনও এমন বিশ্বপরিত্রাণের অভয়বাণী ঘোষিত হইতে পারে ? পরিত্রাতা ভিন্ন পরিত্রাণ-প্রয়াসী জীবের মুখে কখনও এমন মহাউদ্ধারণের ভাষা ব্যক্ত হইতে পারে না।

এবার আমরা ভগবানের ভবিষ্যৎ-বাণীর সার্থকতা দেখিতে পাইব,—

"যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার,
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার।" (চৈতন্য ভাগবৎ।)

এবার বাস্তবিক এমনি অদ্ভুত লীলাই হইবে, যবনের মুখে

হরিনাম শুনিয়া জ্ঞানাভিমানীর চৈতন্য-সঞ্চার হইবে, বেদ-বিচারের কুটিনাটী ঘুচিয়া যাইবে, তান্ত্রিকতা দূর হইবে, সত্যের জয় হইবে, তন্ত্রমন্ত্রের অতীত অপ্রাকৃত হরিনামে বিশ্ব প্লাবিত হইবে। যাহা নিত্য-সত্য, তাহাই মহাউদ্ধারণের কৃপায় জগতবাসী চিরতরে লাভ করিবে। আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও জাতির সহিত জাতির সঙ্ঘর্ষণ থাকিবে না। বিশ্ববাসী প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইয়া বাস্তবিক পক্ষে, বক্ষে ও বাহুতে চিরবিরহীর ব্যাকুলতা লইয়া এবার পরস্পর পরস্পরকে, প্রেমের বুকে তুলিয়া লইবে। অচিরে পরমহংস বালকৃষ্ণের দৈববাণী বর্ণে বর্ণে সফল হইতে দেখিব, বাস্তবিকই এবার—

"জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু শ্রীহরি পুরুষ,
প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমবন্যাবেগে,
ভাসাইবে ত্রিজগত ; সুরনরনারী,
যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব আদি সব,
পশুপক্ষী চরাচর স্থাবর জঙ্গম।"

বাস্তবিকই এবার,—

"কর্ম্মী-জ্ঞানী বাসভূমি ইউরোপ রুষ,
জার্ম্মণি, ডেন্মার্ক, ফ্রান্স, আর্ল্যাণ্ড, হলাণ্ড,
জাপান প্রভৃতি দ্বীপ সর্ব্ব মহাদেশ,
গ্রাম, দেশ, পল্লীপাড়া, নগর, সহর,
আমেরিকা ও আফ্রিকা ; বিশ্ব চরাচর
অচিরে ভাসিবে গৌর-প্রেমের বন্যায়।"

বাস্তবিকই অচিরে—

"হরিবোল" মহাধ্বনি গগন ছাইবে,
গগন ভেদিয়া উঠি, বৈকুণ্ঠ-গোলোকে
মাতাবে সকল লোক কিশোরী রাধার,
কামগন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমানন্দ রসে।"

বাস্তবিকই বিশ্ববাসী—

"রাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ জগদ্বন্ধু জয়
গাইবে পঞ্চম স্বরে পরম হরিষে।"

বাস্তবিকই এবার—

"অবতার প্রকাশের আইল সময়,
মহাপ্রকাশ উচ্ছ্বাসে নাচিবে অচিরে,"
জয় জগদ্বন্ধু রোলে মাতায়ে মেদিনী।

এস ভ্রাতৃগণ! আর বিলম্ব কেন, উঠ—জাগ—
'জয় জগদ্বন্ধু বলে',—মাতায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি,
জাগিয়ে উঠুক মৃত-প্রাণ!

আর বিলম্ব করিও না, আর পথভ্রান্ত পথিকের মত, চক্ষুহীন অন্ধের মত বিপথে ঘুরিয়া বেড়াইও না; সরল বিশ্বাসে হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, মহাউদ্ধারণের নবলীলার অমৃতময় প্লাবনে মুগ্ধ হইয়া যাইবে! হেলায় দিন হারাইলে পরে অনুতাপে জর্জ্জরিত হইলেও কোন ফলোদয় হইবে না। অবিশ্বাসীগণ, যুগে যুগেই অবতারকে আগে কষ্ট দিয়া, নিন্দা কুৎসায় পাপরসনা-কণ্ডুয়নের জ্বালা নিবৃত্তি করিয়া, পরে হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া মরে। যীশুকে অবিশ্বাসী মোহান্ধগণ

কত কষ্ট দিয়াই না লোহার প্রেক শরীরের নানা স্থানে, বিদ্ধ করিয়া মারিয়াছিল, সক্রেটীস্ নামক মহাপুরুষকে বিধর্ম্মীগণ হেমলক-নামক বৃক্ষের বিষাক্ত পাতা খাওয়াইয়া কেমন পৈশাচিক ভাবে মারিয়াছিল! শ্রীকৃষ্ণকে অবিশ্বাসীগণ গোয়ালার ছেলে বলিয়া কত অবজ্ঞা করিয়াছিল, পরে যখন, তাঁহার অসাধারণ ভগবৎ-শক্তি জগতে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপ-প্রাণের জ্বালা নিবৃত্তি করিবার জন্য মিথ্যা জনরব প্রচার করিল,—"কৃষ্ণ,যদুবংশীয় একজন বালককে বধ করিয়া তাহার কণ্ঠস্থিত মণি চুরি করিয়াছে !!" হায়! সেই মণি চুরির তিথিটি আজিও আমাদের দেশে "নষ্টচন্দ্র" নামে আখ্যাত হইতেছে !! এতদ্ব্যতীত কংশ ও শিশুপাল প্রভৃতি অসুর প্রকৃতির লোক তাঁহার প্রাণবধ করার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল !! পুতনা, বিষ পর্য্যন্ত দিয়াছিল! হা ভগবান! তোমাকে যুগে যুগে এমন করিয়াই মায়ামুগ্ধ জীবের কাছে লাঞ্ছিত হইতে হয়! গৌরাঙ্গকেও আমাদের মত জগাই মাধাইর মুখে শুনিতে হইয়াছিল—

নিমে, রোঘো, বলা, তিনটে কলির চেলা! যিনি কলিদর্প দলনের জন্য আসিয়াছিলেন, কলির জীব তাঁহাকেই কলির চেলা (মহাপাপী) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল! পূর্ব্বে করিয়াছিল এখনও কি তাহারা নাই? সবই আছে, কত জন ক্রুশ লইয়া, কত জন পুতনার মত বিষের বাটী হাতে লইয়া, কত জন কংশের মত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, কত জন জটিলা কুটিলার মত পাপ-রসনা লইয়া এখনও দাঁড়াইয়া নিজ নিজ পাপ

অভিনয়ে লিপ্ত রহিয়াছে !! হা প্রভো ! এ জটিলা কুটিলা কি সংসার হইতে অন্তর্হিত হইবে না ! এ কংশ শিশুপাল কি জগৎ হইতে চিরবিদায় লাভ করিবে না !! জগৎ কি তোমার নামে-প্রেমে একটানা স্রোতে প্লাবিত হইবে না !!!

হায়, কেন এমন হয় ? মানুষ, যুগে যুগেই ভগবানকে নিন্দা কুৎসা করিবার—এমন কি বধ পর্য্যন্ত করিবার—কেন এমন করিয়া পিশাচের অভিনয় করিয়া থাকে ?

মায়ামুগ্ধ কামুক-জীব, কামিনীকাঞ্চন ভোগই জীবনের একমাত্র সার-কর্ত্তব্য ও চরম লক্ষ্য মনে করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ শূকরের মত অবিরত পাপপঙ্কে গড়াগড়ি দেয় ! তাহাদের মত বিরুদ্ধ কোন ধর্ম্ম কথা বা ভগবৎ কথা শুনিলেই জটিলা কুটিলার মত লম্ফ ঝম্প করিয়া উঠে। মনে করে—আমার 'এ' বড় সাধের বিষ্ঠা-ভোগ বুঝি ঘুচিয়া গেল, এত সাধের নরকাভিনয় বুঝি ছুটিয়া গেল !! অমনি ক্রোধান্ধ হইয়া অবতারীর উপরেও আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে ; তাহারা আপনার অভিমানের অজ্ঞানতায় সর্ব্বদা মনে করে, আমি যাহা বুঝি, ইহাই ঠিক, ইহাই ভাল, আর ওসব পাগ্‌লামি। এই জন্য যখনই শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া মায়ামুগ্ধ জীবের রুচিবিরুদ্ধ কথা বলিতে আসেন, যখনই মায়ার অনিত্যতা দেখাইয়া জীবকে সত্যধর্ম্মে গঠিত করিয়া আপনার প্রেমের বুকে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করেন, তখনই এ সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হয়। তখনই কামুক বদ্ধজীব, খড়্গহস্ত হইয়া ভগবানের নিন্দা কুৎসাতে এমন কি প্রাণনাশে পর্য্যন্ত বদ্ধপরিকর হয়।

যে, নীলবর্ণ চশমা চক্ষে দেয় সে জগৎটাই নীলবর্ণ দেখে। কিন্তু তাই বলিয়া জগৎ বাস্তবিক নীলবর্ণ নহে। বদ্ধপাপী নিজের কামকলুষ চক্ষে, জগৎকে, এমন কি ভগবানকে পর্য্যন্তও কুৎসিত চিত্রে অবলোকন করিয়া বধ করিবার পর্য্যন্তও চেষ্টা করে! পাপীর চক্ষে জগৎ পাপী হইলেও, অন্ধের চক্ষে জগৎ অন্ধকার হইলেও, বাস্তবিক সেটি সম্পূর্ণ ভুল, সেটি সম্পূর্ণ তাহার চক্ষুদোষ বা নীল চশমার গুণমাত্র।

একদিন আমরা যুবতীর বুকে বসিয়া পবিত্র দেবশিশুর মত মাতৃভাবে স্তন্য পান করিয়াছি,এখন নেংটা পাঁচ বৎসরের বালিকার দিকে চাহিলেও শিহরিয়া উঠি,এমন কি সুন্দর রঙ ফলান যুবতীর চিত্রপটখানার দিকে পর্য্যন্তও সরলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে পারি না! কামের চক্ষে সর্ব্বত্রই কামের বিকাশ!! এ কামের স্ফূরণ কোথায়? ঐ সদানন্দময়ী নেংটা বালিকায়? ঐ চিত্রপটে? না কি, আমারই পশু হৃদয়ে, আমারই কাম কলুষিত চক্ষে? বালিকাতে কি কোন কাম ভাব আছে? না কি রঞ্জিত চিত্রপটের রঙ্গের ভিতরে কাম আছে? সবই আমার হৃদয় হইতে স্ফূরিত ও আমার পৈশাচিক দৃষ্টিতে কলঙ্কিত দেখিতে পাই। হায় সে দিন আর এ দিন, কত তফাৎ! যে দিন যুবতীর বুকে বসিয়া পবিত্র দেবশিশুটির মত মাতৃভাবে স্তন্যপান করিয়াছি কোথায় সেদিন? সে দিন নাই, সে পবিত্রতা নাই, সে হৃদয় নাই, সে চক্ষু নাই, সেইজন্য আজ সর্ব্বত্র পবিত্রকে অপবিত্র দেখি!! জীব ত জীব, ভগবানকে পর্য্যন্তও ছাড়িয়া কথা বলি না। তাঁহারও সৃষ্টির দোষ, ব্যবস্থার

দোষ, লীলার দোষ কত কি দেখিয়া থাকি, বলিয়া থাকি। এবং যুগে যুগেই অবতারকে বধ করিবার পর্য্যন্তও চেষ্টা করিতে বিরত হই না!

আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহাই দেখি না কেন, সে সবই আমাদের নিজের ভিতর হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বহির্জ্জগতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। মানুষ, নিজের চক্ষেই জগৎ দেখে, নিজের চশমার রঙ্গ অনুসারেই জগৎ রঞ্জিত দেখে; কিন্তু বাস্তবিক সে চিত্র, সে রঙ্গ, বাহ্যজগতে নহে; মানুষেরই চক্ষে, মানুষেরই নিজ নিজ চশমাতে। মানুষ, আপনার বিকৃত চশমাটা চক্ষে দিয়া, অবিরত জগতটাতে নানারূপ বিকট চিত্রের বিকাশ দেখিয়া, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ও পরপীড়ণে লিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি বাস্তবিক বুঝিতে পায় যে, এসব, আমারই বৃত্তির বিকাশ মাত্র, আমারই চশমার বিকৃত রঙ্গমাত্র, তাহা হইলে, আর পর-নিন্দাতে লিপ্ত না হইয়া, চশমাটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। আমরা মায়ামুগ্ধ অজ্ঞ জীব, নিজের অজ্ঞতা বুঝি না, পরকে অজ্ঞান বলি, নিজের পাগ্‌লামি বুঝি না, পরকে পাগল বলি। মোটের উপর নিজের হৃদয়ের সম্পূর্ণ ছবিটি জগতে বিকাশ দেখিয়া নানাসাজে নানাভাবে, পৈশাচিক নরকের অভিনয় করি; তাই ভগবানকেও সে কলঙ্কের চিত্রে কলঙ্কিত করিয়া যা তা বলিয়া, যা তা করিয়া লাঞ্ছনা দিতেও ত্রুটি করি না!! এইজন্যই যুগে যুগে অবতারের সহিত বদ্ধ জীবের তুমুল সঙ্ঘর্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়!!

এবারও কি আমরা বর্ত্তমান মহাবতারীর প্রতি নিজ নিজ পৈশাচিক ভাবরাশি আরোপ করিয়া, নানা প্রকার নির্য্যাতনের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিব? কখনই নয়! আমরা জীব, সে মনপ্রাণ লইয়া গঠিতই নয়! নিজকে বুঝি আর না বুঝি, জানি আর না জানি, চিনি আর না চিনি, ভগবানকে লইয়া কথায় কথায় নাড়া চাড়া করিতে ছাড়ি না! আমরা রাখিলে থাকেন, না রাখিলে উড়িয়া যান! মায়ামুগ্ধ জ্ঞানে কখনও বলি সাকার, কখনও বলি নিরাকার, আবার কখনও নাস্তি বলিয়া উড়াইয়াই দেই। ধন্য মায়ান্ধ জীবের অজ্ঞতা! যে জ্ঞানে আপনাকে জানে না, বুঝে না সেই জ্ঞানে ভগবানকে জানিতে চায়! অভিমানে অজ্ঞানতার মাপ-কাঠি লইয়া অনন্তানন্তময়কে মাপিতে যায়! অকিঞ্চিৎকর আমিত্বের মানদণ্ডে তাঁহাকে ওজন করিয়া বুঝিয়া লইতে চায়! সীমাবদ্ধ অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র-জ্ঞানে তাঁহার অনন্ত ভাব, অনন্ত প্রেম, অনন্ত লীলামাধুর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পরিশেষে ক্ষিপ্তের মত অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগে, নিজের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বদর্শিতার পরিচয় দিতে বসে। তাই আমরা অন্যান্য অবতারে ভগবানকে যেরূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়াছি, এবার বর্ত্তমান মহাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুহরিকেও সেইরূপ লাঞ্ছনা দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি! কত জন, কংশের মত অস্ত্র লইয়া, পুতনার মত বিষ দিয়া, জটিলা কুটিলার মত পাপ-রসনা লইয়া অবিরত নিজ নিজ নরকাভিনয় করিতেছে!—নিষ্কলঙ্ক চাঁদে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে! যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্য, একমাত্র

পবিত্র, একমাত্র নিষ্কলঙ্ক, সেই শ্রীশ্রীপ্রভুর নামে কত নারকি পিশাচ, নিন্দা কুৎসা রটাইয়া নিজের পৈশাচিকতার পরিচয় প্রদান করিতেছে! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—পাবনাতে যখন আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীশ্রীপ্রভুর অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল, কত জন মায়িক সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তখন মায়ামুগ্ধ জীব, ঈর্ষাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া প্রভুর নামে মিথ্যা গুজব তুলিয়া নিন্দা কুৎসা করিতে, শাসন ও পীড়ন পর্য্যন্ত করিতেও বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। অনেকে বলিত,—"জগতের লোক-মজান শক্তি জন্মিয়াছে, মোহন মন্ত্র দিয়া লোক মজাইতেছে! কেহ কেহ বলিত,—জগৎ ছেলেগুলির মাথা খেয়ে ফেল্লে! তাদের পড়াশুনা সব গোল্লায় গেল।" অনেক অভিভাবক নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াও জগদ্বন্ধুর এই লোকমজান শক্তি ঘুচাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। শুনিয়াছি, কংশাসুরের মত কোন দুর্ম্মতি, শ্রীশ্রীপ্রভুর সোণার অঙ্গে আঘাত পর্য্যন্তও করিতে ত্রুটি করে নাই! অনেকে ইহার প্রতিকার করিতে চাহিলে, ক্ষমার দেবতা শ্রীশ্রীপ্রভু, শত অনুরোধেও সেই ঘাতকের নাম প্রকাশ না করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা নিরস্ত হও, ক্রোধ করিও না আমাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, তবে, কেহই মারিয়া ফেলিতে পারিবে না!" একদিন শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিশ্বাস (বাদল বিশ্বাস) মহাশয় একটি লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,সে আপনাকে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে!! এত বড় স্পর্দ্ধা!! আমি এখনই তাহার

পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিব! শ্রীশ্রীপ্রভু হাসিয়া বলিলেন,—"যিনি একটি পিপীলিকা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে পারেন, তাঁহার আবার একটা জীবের ভয়! তোমরা কাহারও প্রতি ক্রোধ করিও না!" হা ভগবান! হা প্রভো! জীব উদ্ধারে আসিয়া যুগে যুগে এইরূপেই তোমাকে বহির্ম্মুখ জীবের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়! হায়! নবদ্বীপেও কয়েকটি পিশাচ জুটিয়া এইরূপে শ্রীশ্রীপ্রভুর চিরপবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা করিয়াছিল! তথায় এক ডিপুটি বাবুর স্ত্রী ও কন্যা শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্ত হন। তাঁহারা প্রভুকে পূর্ণভগবানের আসনে বসাইয়াই পূজা করিতেন, যখন তখন প্রভুর কাছে আসিতেন, প্রভুর নাম জপ করিতেন, তুলসী চন্দনে প্রভুর ফটো পূজা করিতেন, দুষ্ট লোকের প্রাণে ইহা সহ্য হইল না! তাহারা যা'তা বলিয়া কলঙ্ক ঘোষণা করিতে লাগিল! কিন্তু, "কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে, কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে," মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা, সত্য চির সত্য! তাই সমস্ত মিথ্যার কুহক জাল ভেদ করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাউদ্ধারণের মহাশক্তি, মহাতেজ আজ সমস্ত জগৎকে ধীরে ধীরে আকুল করিয়া টানিতেছে! আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, শুনিয়াছি-শ্রীশ্রীপ্রভু কৈশোরে যখন ফরিদপুর জেলাস্কুলে পড়িতেন, তখন এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী প্রভু, তখন একদিন না কি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর বাড়ী হইতেই প্রত্যক্ষ দর্শনের মত লিখিয়া আনিয়াছিলেন! ইহাতে

প্রভুরই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বদর্শিতা প্রকাশ থাকিলেও শিক্ষক মহাশয়গণ তখন বালক জগদ্বন্ধুর এ ঐশী শক্তির প্রভাব কি করিয়া বুঝিবেন! প্রভুকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইল না। জগজ্জীবের নিকট জগৎ-বন্ধুর পরীক্ষা !!—না দেওয়াটা ভালই হইল। প্রভু স্কুল ছাড়িলেন। দুঃখের বিষয় এই ঘটনাকে আমাদের মায়ামুগ্ধ জীব, অনেকে শ্রীশ্রীপ্রভুর বৈরাগ্যের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে কতজন গুরুতর অন্যায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও বুক ফুলাইয়া বেড়ায়, কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা পায় তবু আবার করে, পাপের খাদে ডুবিয়া মরে। পাঠক মহাশয়, প্রভুর সতর বৎসর বয়সের চিত্রপটখানি চাহিয়া দেখুন দেখি, এ অপ্রাকৃত ভাব কি, বিদ্যালয় ত্যাগের হঠাৎ বৈরাগ্যের লক্ষণ!

শ্রীশ্রীপ্রভু নিত্য-সত্য পূর্ণপবিত্র পূর্ণভগবান-শ্রীহরি। তাই আমরা নির্ভীকভাবে তাঁহার অবতারবাদের মহিমা ঘোষণার সহিত, কামুক পিশাচের কুৎসাগুলিও উল্লেখ করিলাম। নিষ্কলঙ্ক প্রভুতে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না, তাই, আমরা অকপটে জটিলা কুটিলার রুচি-প্রবৃত্তিও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিলাম না। গৌরাঙ্গলীলার সময়ও বালক নিমাইতে এইরূপ ভগবত্তার প্রকাশ হইত, এবং সে সমস্ত ব্যবহার দেখিয়া সাধারণে ক্রোধে খড়্গহস্ত হইয়া নিমাইকে ধরিবার ও মারিবার জন্য ধাবিত হইত! অবশেষে শচীমাতার কাছে যাইয়া শাসন গর্জ্জন করিত। মাতা, দুষ্ট-ছেলের ব্যবহারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয়

করিয়া শান্ত করিয়া দিতেন। কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার! কেহ পূজা করিতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছে, অমনি নিমাই যাইয়া পূজার উপকরণগুলিই খাইয়া ফেলিল!

নিমাইর মুখেই এ সম্বন্ধে আমরা শুনিতে পাই,—

"মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান,
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমাস্থান।"

তবু রক্ষা, প্রভু জগদ্বন্ধু বাল্যলীলায় এবার সেরূপ কাহারও নৈবিদ্য লইয়াও দৌড় দেন নাই, বা বাঁশী হাতে করিয়াও কদমতলায় যাইয়া কোন কুলবালাকে রাধা রাধা বলিয়া ডাকেন নাই; এবার সেরূপটি করিলে বোধ হয় আমরা যীশুর মত ক্রুশে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতাম না! কিন্তু অচিরেই প্রভু এবার জগতের নৈবিদ্য ধরিয়া টান দিবেন,জগৎবাসী জটিলা কুটিলাকে বাঁশীর তানে মুগ্ধ করিয়া নিকুঞ্জে টানিয়া আনিবেন, ভূলোক গোলোক হইবে!! এবার আর বৌকে শাসন করা ঘটিবে না; জটিলা কুটিলা আগেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'! বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িবে! অচিরেই জগৎবাসী জগদ্বন্ধুর ভবভয়হারী অভয়-চরণতলে আসিয়া আশ্রয় লইয়া চিরতাপ-দগ্ধ প্রাণ শীতল করিবে। আর বিলম্ব নাই,চারি দিকে, জগদ্বন্ধুর যে প্রাণমাতান মধুর তান জগৎ আলোড়িত করিয়া—দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিতেছে! সে প্রাণোন্মাদনা-ময় বিশ্বজাগরণের প্রেমের আহ্বানে ব্রজবালার জাতিকুল অকুলে ভাসিবার আর বিলম্ব নাই, আর দু'দিন পরে আমরা ঘরে ঘরেই শুনিতে পাইব,—

ননদী তুই বলিস্ নগরে, ভেসেছে রাই রাজনন্দিনী
বন্ধুর কলঙ্ক সাগরে !

অবতারকে চিনিবার যে যে উপায় আছে, আমরা নানা প্রকার দৈব-অনুভূতি সহ এ পর্য্যন্ত পাঠক মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যত প্রমাণই দেওয়া যা'ক্ না কেন, সর্ব্বোপরি চাই, প্রাণের সরল ভাব ও সরল বিশ্বাস। স্ফটিকমণি ভিন্ন মৃণ্ময় পাত্রে সূর্য্যের আলো কখনও প্রতিফলিত হয় না। আমাদের সম্মুখ দিয়া হয় ত, কত মুক্ত-মহাপুরুষ চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু আমাদের জীব-চক্ষে তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়াই উড়াইয়া দিতেছি ! শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ আসিলেন, ক'জনে ধরিতে পারিল ? যুগে যুগেই মায়ামুগ্ধ বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাই বেশী। এবারও তিনি জগদ্বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা ক'জনে ধরিতে বা বুঝিতে পারিতেছি ? ভগবানের কোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই, তাই তিনি ঐশ্বর্য্য বিকাশ না করিয়া দীনাতীত দীনভাবেই জগতে আত্মকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যান ; জীব, কাষ্ঠপুত্তলিকার মত 'হা' করিয়া চাহিয়া থাকে। জগৎকে নূতন করিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া গেলে, পরে অনেকের চমক ভাঙ্গে। "তাই ত ! 'এ' ত মানুষ নয় ! মানুষে কি, এমন অমানুষিক শক্তি থাকে ? মানুষের ইঙ্গিতে কি এমন করিয়া জগৎ নূতন পথে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে ?" ঠিক কথা, আমরাও তোমাদের সহিত সমস্বরে বলিতেছি,—মানুষের চীৎকারে জগৎ দূরে থাকুক্, পিপীলিকাটিও নূতন পথে পা দিতে রাজী নহে। মানুষ,

সাধন ভজনে যতই অগ্রসর হ'ক, সাধকই হ'ক আর সিদ্ধই হ'ক, যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতিতে, শূন্যভরেই গমন করুন, আর গণ্ডুষে সমুদ্র শোষণই করুন, তাঁহারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া উপদেষ্টা পর্য্যন্ত হইতে পারেন, নানা সদুপদেশে ও সৎ দৃষ্টান্তে সৎপথ দেখাইয়া ভগবত্তত্ত্ব বুঝাইয়া—এমন কি আত্ম-শক্তি সঞ্চার করিয়া অনেকের মন-প্রাণের অবস্থাও গঠিত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু জগৎকে নূতনভাবে নূতন-জ্ঞানে নূতন-প্রাণে নূতন করিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিতে ভগবান ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই। জীবের মায়া মোহ বিদূরিত করিয়া, পাপ তাপ হরণ করিয়া আর কেহ জগৎকে পরিবর্ত্তনের পথে লইয়া যাইতে পারে না। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন একমাত্র ভগবানেরই কার্য্য। জগতের বন্ধু ভিন্ন জগতের উপর হাত আর কাহারও নাই, আর কাহারও ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত, নূতন ভাবে গঠিত ও নূতন পথে ধাবিত হইতে পারে না। জগৎকে যখনই নূতন করিয়া গঠিত করিবার দরকার হয়, যখনই নূতন পথে পরিচালিত করিবার আবশ্যক হয়, তখনই তিনি, মানুষের ভিতরে অমানুষিক ভাব ও শক্তি লইয়া আসিয়া থাকেন। আমরা মায়ান্ধ জীব, অনেক সময় মহাবতারী শ্রীভগবানকে জীব চক্ষে বেশী হয় ত সাধু মহাপুরুষ পর্য্যন্ত মনে করিতে পারি, ইহার অতিরিক্ত অনুভূতি আমাদের আসে না। কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু আছে, যাঁহাদের বুঝিবার হৃদয় আছে, তাঁহারা, মানুষবেশধারী অবতারীর প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক কথায়

সাধু মহাপুরুষদিগের অতীত অবস্থা এবং অচিন্তনীয় নব মাধুর্য্যময় ও ভাবময় নব-যুগ প্রবর্ত্তনার নব নব ব্যাপার দেখিয়া সহজেই তাঁহাকে ধরিতে পারেন—শ্রীভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া বুঝিতে পারেন।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা যাঁহার আগমনে, জগতে নূতন ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে দেখিবে, যাঁহার প্রত্যেক ভাবে, ভাষায় ও কার্য্যে অপার্থিব অবস্থা দেখিতে পাইবে, যাঁহার কার্য্যাবলী সাধারণ মানুষের অতীত এবং সাধু সন্ন্যাসীদিগেরও অতীত, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তিনিই মহাবতারী, তিনিই মানুষ বেশধারী হইলেও মানুষের পরিত্রাণকারী, পূর্ণ ভগবান শ্রীহরি বলিয়া জানিবে। এই দেখুন,—

যিনি শৈশব হইতেই জীবভাবের অতীত, যাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্য মানবীয় ভাবের বাহিরে,—যিনি কামিনী-কাঞ্চন হইতে, সংসার হইতে, সমাজ হইতে, সামাজিক রীতি-নীতি ও ব্যবহার হইতে, বেশভূষা হইতে, এমন কি সাধু সন্ন্যাসীরও অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতভাবে, জগতে পুরাতনের ভিতরে নূতনত্ব আঁকিয়া, নূতনত্বে পুরাতনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, নূতন ভাবে, নূতন রসে নূতন মূর্চ্ছনায় জগৎকে মাতাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, যিনি চির-আবরণের ভিতরে থাকিয়াও নীরব মহাপ্রাণতায়,—মহাউদ্ধারণ শক্তির অদৃশ্য প্রেরণায়, পতিত-জাতির উন্নয়ন, বিশ্বজনীন উদারধর্ম্মের সাম্যক্ষেত্রে সর্ব্বজাতির প্রেমসম্মিলন, এবং ভাব-রাগ-রস-প্রেমের অমৃতময় প্লাবনে জগৎকে নিমজ্জন করিতেছেন, যিনি

লোক-লোচনের অন্তরালে বায়ু ও আলোর অগম্য ক্ষুদ্র কুটীরে নীরবে নির্ব্বিকারে অবস্থান করিয়াও অদৃশ্য আকর্ষণে জগৎ-বাসীকে—অধম পতিতকে প্রেমের শান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন; নানা সম্প্রদায়স্থ ভক্ত, অভক্ত, অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তি, আবেশে দৈববাণীতে স্বপ্নে যাঁহাকে মহাবতারী পূর্ণ-ভগবান বলিয়া জানিয়া অবিরত জলস্রোতের মত ছুটিয়া আসিতেছে ও যাঁহার একাধারে, রাধাকৃষ্ণ, নিতাইগৌর, নারায়ণ প্রভৃতি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতেছে, যাঁহার মহানামে আজ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, যাঁহার মহাপ্রেমের নীরব আহ্বানে জগৎ আহুত, যাঁহার অপ্রাকৃত কিশোর কিশোরীর নিষ্কাম-প্রেমের মাধুর্য্যে আজ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা প্রকৃত ভাব ও প্রকৃত রসে অমৃতায়মান, যাঁহার অপ্রাকৃত নিষ্কাম-প্রেমমাধুর্য্যে আজ বৈষ্ণব-সমাজ হারানিধি বুকে লইয়া শান্তির সলিল-সিঞ্চনে শীতল হইতে বসিয়াছে, যাঁহার নূতন ভাব-মাধুর্য্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম আবার গোরাচাঁদের প্রকৃত নিখাদ নিভাজ নামামৃতের ফোয়ারায় জগৎ পবিত্র করিতে বসিয়াছে, যাঁহার অপ্রাকৃত মহা-ভাবে টীকা টিপ্পনীর গিল্টি করা গৌরলীলা আজ বৈদিক ও তান্ত্রিক আবর্জ্জনা ধুইয়া মুছিয়া আবার প্রকৃত স্বরূপে হরিনাম ও রাধাপ্রেমে মহাউদ্ধারণে ব্রতী হইয়াছে, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষপাতে গিল্টি করা ব্রজলীলা হইতে আবার নির্ম্মল নিষ্কাম ব্রজরস ক্ষরিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিতে ছুটিয়াছে, যাঁহার অনন্ত প্রেমের বিন্দু বরিষণে আজ এই আমার মত মহাপাপী মহামূর্খ অধম পতিত নরকের কীট, এই

প্রেমযোগের লেখনী ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে; যাঁহার অনন্ত প্রেমের আহ্বানে আজ আমার মত অগণিত নরনারী নরক-নিলয় হইতে ছুটিয়া আসিয়া শান্তি-সুখের অধিকারী হইতেছে, যিনি আপনাকে অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তিনি যে নবযুগ প্রবর্ত্তক মহাবতারী পূর্ণ ভগবান, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

আজ আমরা জগৎবাসীকে গগনভেদী-রোলে অভ্রান্ত শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি,—যাঁহার জন্য আজ আপনারা সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহার দিকে চাহিয়া আজ জগৎ-বাসী পুরুষনারী ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পরিত্রাহি পরিত্রাহি বলিয়া ডাকিতেছেন, যাঁহাব আগমন প্রতীক্ষায় আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান পাদ্য-অর্ঘ্য হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি আসিয়াছেন, তিনি জগদ্বন্ধুরূপে জগদুদ্ধারণে অবতীর্ণ হইয়াছেন !!! অচিরেই সকলে তাঁহার মহাপ্রকাশে জগৎময় মহাউদ্ধারণের বিশ্বজনীন প্রেমের মহালীলা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবেন। আজ সমস্ত সম্প্রদায়ের ও সর্ব্ব অবতারের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হইবে।

আসুন ভ্রাতৃগণ! বৃথা জ্ঞানাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সরল বিশ্বাসের হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করুন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজ্ঞানে, অকিঞ্চিৎকর জীবত্বের অভিমানে কখনও অনন্তানন্তময় শ্রীভগবানকে জানিতে পারা যায় না। ভাই! আমরা মায়ামুগ্ধ হইয়াও যে জ্ঞানী, আমরা নিজকে বাদ দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের আর

সব বিষয়েই যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এখন এই দীনের একটা অনুরোধ—এই সর্ব্বজ্ঞের মোহের রাজ্য হইতে,—অভিমানের সিংহাসন হইতে একটিবার নামিয়া আসিয়া, সরল বিশ্বাসের জ্ঞানাঞ্জনে রঞ্জিত চক্ষুরুন্মিলন কর, বিশ্বময় মহাগানে তান মিলাইয়া, অগণিত ভক্তি-বিহ্বল-প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া মহাবতারী জগদ্বন্ধুহরির প্রেমের জয় গাও। আজ বিশ্বজাগরণের নব ঊষালোকে পেচকের বৃত্তি লইয়া, চক্ষু মুদিয়া মোহের কোঠরে বসিয়া থাকা, একান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয় ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রীভগবান আমাদের জন্য, এবার নন্দ-নন্দনের মত :—শচী-নন্দনের মত মানুষবেশে মানুষের পরিত্রাণের জন্য—জগদ্বন্ধুরূপে জগতে প্রেমের প্লাবনের জন্য আসিয়াছেন। আসিয়াছেন—সেও সামান্য দিন নহে, চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন যাবৎ মহাউদ্ধারণের মহালীলা জগতে আরম্ভ হইয়াছে, অনেক দিন হইতে ধর্ম্মের নূতন স্রোত, কলি-কবলিত জগতের ভীষণ প্রলঙ্কর আবর্ত্তের উপর দিয়া সময় ও অবস্থা অনুসারে নূতন নূতন জ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া দিয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামী, শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ অবধূত, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সময় হইতে 'এ' স্রোতের আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতেই এক এক স্থানে এক একজন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া, মহাউদ্ধারণের ইচ্ছায় ভাবী মহালীলার উপযোগী করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট-জগৎকে গড়িয়া আনিতে ব্রতী হইয়াছিলেন,

এবং ভবিষ্যতে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হওয়ার উপযোগী করিবার জন্য সর্ব্বত্রই নূতন নূতন ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে শুষ্ক জ্ঞান-কর্ম্মের ভিতরে আধ্যাত্মিক ভাব ঢালিয়া দেওয়ার জন্য বিবেকানন্দ, এবং প্রাচ্য জগতের পথভ্রান্ত নানা ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ক্রমে পথে আনিবার জন্য, ক্রমে নামের আশ্রয়ে প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ করাইবার জন্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ, শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ অবধুত ঠাকুর মহাশয় সর্ব্ব-ধর্ম্মের ভিতরেই নামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া মহা-উদ্ধারণের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্মে পর্য্যন্ত, নববিধান বা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। আজ কাল খৃষ্টানভায়াদিগকেও মাঝে মাঝে খোল করতাল লইয়া যীশুর কীর্ত্তন করিতে দেখা গিয়া থাকে। মুসলমান সমাজে, বরাবরই নাম জপই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা নামের মালা পর্য্যন্ত জপিয়া থাকেন। তাহাদের নামাজ পড়াটি নাম জপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কার্য্যটি কেমন সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতশক্তি সঞ্চারে হইয়া আসিতেছে, তাই মহা উদ্ধারণলীলা বর্ণনাতে পরমহংস সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—

"

শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ করুণাসাগর,
উত্তাল তরঙ্গাপ্লুত প্রবাহ তুলিলা ;
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পরম দেবতা,
ঢালিলা করুণা রাশি অজস্র প্রবাহে !!!
প্রভু শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বিতরিলা প্রেম।

প্রেমানন্দ সঙ্কীর্ত্তন সরোল্লাসী বিভু
গুপ্ত রহি জগদ্বন্ধু ভাসাইলা প্রেমে !
ধন্য প্রভু জগদ্বন্ধু জগদুদ্ধারণ !
মহাউদ্ধারণ বিভু শ্রীহরি পুরুষ !

(লীলাম্বুধি, ১৫৬ পৃঃ)।

পরমহংস সচ্চিদানন্দ দেবের অনুভূতি কি অপূর্ব্ব অভ্রান্ত ধারণাময় ! ইঁহার মত বর্ত্তমান মহাউদ্ধারণ লীলার তত্ত্বটি ও লীলাকারী হরিপুরুষ জগদ্বন্ধুকে আর কেহই ধরিতে পারেন নাই! ধন্য ইঁহার সাধনা ! ধন্য ইঁহার অভ্রান্ত লীলারস ও ভগবৎ অনুভূতি ! ইনি স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন, সঙ্কীর্ত্তন রসোল্লাসী বিভু জগদ্বন্ধু গুপ্ত থাকিয়া প্রেমে চরাচর ভাসাইলেন, এবং বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে, যথা-নিযুক্তোহস্মি তথাকরোমি ভাবে, স্ব স্ব কার্য্যে মহাউদ্ধারণের মহালীলার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

এখানে পরমহংস সচ্চিদানন্দ দেবের কথাটির সহিত শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দরের একটি বাক্যের আমরা বিশেষ সামঞ্জস্ত দেখিতে পাইতেছি ! শ্রীশ্রীপ্রভু একটি ভক্তকে একদিন বলিয়াছিলেন,—"গৌরলীলার সময়ও মানুষের প্রেমভক্তি গ্রহণের উপযোগী হৃদয় ছিল। কিন্তু এখন মানুষের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ! এখন আর গৌরলীলার মত যাচিয়া যাচিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রেম বিলাইতে গেলে কেহ গ্রহণ করিবে না। এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া প্রেমদান করিতে গেলে জীব বলিবে, ভণ্ড ! এখন ভগবানকে চিনিবার সে চক্ষু নাই, বুঝিবার সে

হৃদয় নাই, তাই নীরবে আত্মশক্তি সঞ্চারে, জীবকে প্রেমভক্তি দিতেই হইবে, জোর করিয়া রোগীকে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার মত যেন তেন প্রকারে জীব-উদ্ধার করিতেই হইবে। তাই আমরা আজ জগদ্বন্ধুকে গোপনে নীরবে থাকিয়া জগতে প্রেম-ভক্তির সঞ্চার করিতে দেখিতে পাইতেছি। পরমহংস সচ্চিদানন্দ দেবও তাহাই বলিয়াছেন,—

"গুপ্ত রহি জগদ্বন্ধু ভাসাইলা প্রেমে!"

আবার নবদ্বীপের খ্যাতনামা সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী (বড় বাবাজী) মহাশয়ের মুখেও আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। হাওড়ার অন্তর্গত পাঁচলা পোঃ ও গ্রাম নিবাসী পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস অধিকারী মহাশয়কে* শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ভগবানের অবতার। তাঁহার শক্তিতেই আমরা কাজ করিয়া থাকি। তিনি যখন যেটুকু করান।"

কি অপূর্ব্ব বিধান!! খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, মাতৃভাবে ভক্তির খেলা জগৎকে দেখাইয়া, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান হওয়ার স্রোত একরূপ বন্ধ করিয়া-ছিলেন। জীবনের শৈশবে, যেমন মায়ের ক্রোড় শান্তিময়, তেমন, ভক্তিপথে বিধর্ম্মীকে টানিয়া তুলিতে হইলে, তাহার পক্ষেও প্রাথমিক মাতৃভাবটিই প্রাণারাম ও শান্তিপ্রদ।

* শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস অধিকারী মহাশয় পরম বৈষ্ণব। ইঁনি শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের বিশেষ কৃপাপাত্র। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইনি বাবাজী মহাশয়ের নিকট ছিলেন। সেই সময় বাবাজী মহাশয় ইঁহাকে শ্রীশ্রীপ্রভু সম্বন্ধীয় উক্ত তত্ত্বটি বলিয়াছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু মাছমাংসেরও ব্যবস্থা আছে, কোন গোল নাই। তখন,—সেই খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম হওয়ার একটানা স্রোতের সময়, একেবারে বৈরাগ্যের ধর্ম্ম সম্মুখে উপস্থিত করিলে, সেদিকে কে ফিরিয়া চাহিত? তাই প্রভুর ভুবন-মঙ্গলময় ইচ্ছায় রামকৃষ্ণ! তৎপর ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্য জ্ঞানকর্ম্মের দেশে ছড়াইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ! পরম তত্ত্বদর্শী শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী বেদান্তের লাঙ্গলে, যেই আমেরিকার জ্ঞানকর্ম্মের ভূমি চাষ আবাদ করিয়া বীজ বপনের উপযোগী করিয়া আসিলেন, অমনি, ভক্তি-বীজের ডালা সাজাইয়া শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী মহাশয় উপস্থিত হইয়া ভক্তি-বীজ বপন করিলেন,—আমেরিকায় রাধাকৃষ্ণ ও নিতাই-গৌরের সেবা ও পূজা আরম্ভ হইল। এইরূপে আস্তে আস্তে—স্তরে স্তরে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা মহাপুরুষের আবির্ভাবে মহাউদ্ধারণের মহালীলার মহাপথ প্রস্তুত হইতে লাগিল! ক্রমে প্রেমধর্ম্মের চিরবিরোধী অস্ত্রশস্ত্র চিরনির্ব্বাসনের জন্য পাশ্চাত্য জগতে অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার পড়িল! যখন এই ঝনৎকার ও হাহাকার, বিশ্বজনীন করুণার ছবি আনিয়া হাতে দিয়া শান্তি ও প্রেম পিপাসায় উদ্ভ্রান্ত করিয়া করুণাময়ের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিবে, সে দিন, আমরা কুরুক্ষেত্রের পর ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের মত এই মহা-কুরুক্ষেত্রের অবসানে জগৎময় মহাপ্রেমরাজ্য সংস্থাপিত হইতে দেখিতে পাইব। সেই দিন জগৎবাসী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাপ্রকাশে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত

হইয়া যাইবে। সকলেই নিজ নিজ প্রাণের দেবতাকে দেখিতে পাইয়া নিত্যানন্দে বিভোর হইয়া যাইবে। সে দিন কবিবর টলষ্টয়ের ও মেডামের ভবিষ্যদ্বাণী জগৎবাসী প্রত্যক্ষ সফল দেখিতে পাইবে। দেখিবে,—

পূর্ব্বদেশ হইতে মহাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুহরি আবির্ভূত হইয়া সমস্ত জগতে প্রেম ও শান্তি প্লাবিত করিতেছেন! সেই দিন আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত দেখিতে পাইব,—"এবার মানুষ ত মানুষ, রাস্তার ইট্ পা'ট্‌কেল পর্য্যন্ত হরিনামে না'চ্‌বে!"

ভ্রাতৃগণ! উঠ! জাগ শীঘ্র প্রস্তুত হও, শীঘ্র অজ্ঞানতার মোহান্ধতা দূর করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাও, অন্ধবিশ্বাস দূর কর! অন্ধবিশ্বাস কাহাকে বলে জান ত? 'আমি যাহা জানি, বুঝি, তাহাই ঠিক, আর আমার অজ্ঞানতার জ্ঞান-পরমাণু যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না সেটি কিছুই নহে, সেটি হইতেই পারে না, এইরূপ কুসংস্কারই অন্ধবিশ্বাস।' অন্ধবিশ্বাসিগণ, অজ্ঞ হইয়াও অভ্রান্ত! তাহাদের জ্ঞানের বাহিরে আর কিছু নাই, ইহাই তাহারা জগৎকে বুঝাইতে ব্যস্ত! যদি কিছু থাকে, তবে সে সবই পাগলের পাগ্‌লামী! কিন্তু যাহারা বাস্তবিক জ্ঞানী, তাঁহাদের জ্ঞান-পরমাণু বিশ্বের বালুকণার নিকটেও পরাস্ত স্বীকার করিয়া সর্ব্বত্রই অনন্ত জ্ঞানময় ও প্রেমময়ের সর্ব্ব-শক্তিমত্তায় বিভোর হইয়া থাকে। তাই জ্ঞানবীর সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন "আমি জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড কুড়াইতেছি মাত্র।" যে বাস্তবিক জ্ঞানী সে সহজেই বিশ্বাস করে, ও

বুঝিতে পারে—ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় আমার অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান-পরমাণু সমুদ্রের নিকট শিশির বিন্দু, এবং অনন্তানন্তময় ভগবানের অনন্ত অব্যক্ত তত্ত্বের নিকট আমি অন্ধতম অজ্ঞ কীটাণু। যে আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও অজ্ঞতা বুঝিতে পারে, সে সহজেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সর্ব্ব কৃতকার্য্যতায় বিশ্বাস করে, এবং বুঝিতে পারে,—

ভগবান যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন তিনি সবই পারেন, তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই, তিনি নিরাকার হইতে পারেন, আর সাকার হইতে পারেন না, এরূপ অপূর্ণতা ভগবানে থাকিতে পারে না। অতএব, তিনি যুগে যুগে মানুষভাবেও মানুষের পরিত্রাণের জন্য আসিয়া থাকেন, অতি সত্য কথা। সরল বিশ্বাসীগণ তাই সরলবিশ্বাসে অনুভব করে,—পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন তিনি, রাম, কৃষ্ণ ও গৌররূপে আসিয়াছিলেন, এবার জগদ্বন্ধুরূপেও তেমন আসিতে পারেন এবং আসিয়াছেন। 'ইহা হইতেই পারে না,' 'এটি অসম্ভব' ইত্যাকার সীমাবদ্ধ বিশ্বাসই অন্ধবিশ্বাস। তারের খবর প্রচার হওয়ার পূর্ব্বে কেহ, সেরূপ কথা শুনিলে হয়ত পাগল বলিয়া হাসিত, আজ কিন্তু বিনা-তারের খবরেও আমাদের আর বিস্ময়ের বিষয় নাই! অতএব, যাঁহারা শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তায় অভাবের আরোপ করিয়া তাঁহার অবতারবাদ স্বীকার করেন না, এবং সাকারবাদীদিগকে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া টিট্‌কারী দিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাঁহারাই অন্ধবিশ্বাসী; এবং সীমাবদ্ধ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের অভিমানে সর্ব্বজ্ঞ সাজাটাই তাঁহাদের অন্ধবিশ্বাসের

ফল। ভ্রাতৃগণ, তোমরা মহাবতারীর মহালীলারস পান করিতে চাওত, যুগে যুগে তাঁহার আবির্ভাবে মাতোয়ারা হইতে চাওত, সরল বিশ্বাসে শ্রীভগবানের সর্ব্ব-শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিয়া জয় জগদ্বন্ধুহরি বলিয়া ছুটিয়া এস, অচিন্ত্য কল্পনাতীত রসমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মরজগতেই অমরবাঞ্ছিত নিত্যানন্দে বিভোর হইয়া যাইবে।

প্রেমের প্লাবন।

আজ আমরা পাঠক মহাশয়কে পূর্ণ-অবতারী ভগবান শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুহরি সম্বন্ধে নানা প্রকার দৈব অনুভূতি উল্লেখ করিয়া, তৎসহ প্রভুর শ্রীমুখের মহাবাক্যের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছি। জগৎবাসী বলিতেছেন,—"ভগবান, আসিতেছেন"; জগদ্বন্ধু বলিতেছেন,—"অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং শ্রীহরি আমি আসিয়াছি।" জগৎবাসী বলিতেছেন,—"এবার সমস্ত জগতে প্রেম ও শান্তি সংস্থাপিত হইবে"; জগদ্বন্ধু বলিতেছেন,—"এবার হরিনামে, রাধাপ্রেমে বিশ্ব প্লাবিত করিব;—এমন কি বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু!" জগৎবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায় বলিতেছেন,—"এবার গৌর, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, বুদ্ধ ও যীশু আবির্ভূত হইবেন"; জগদ্বন্ধু বলিতেছেন,—"এবার আমার একাধারেই সব।" এস ভাই! আর চিন্তা কি? ভক্তের ভগবান, ভক্তের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাসবাণী,—প্রাণারাম

অভয়বাণী, —ভুবন-মঙ্গলময় শুভ-আশীর্ব্বাণী—আপনার আবির্ভাব কাহিনী জগৎকে জানাইয়াছেন। ভাই! প্রভু আসিয়া তোমাদিগকে মঙ্গলময় শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছেন, আর বিলম্ব কেন, সকলেই এস তোমাদের যাঁর যাঁরটি সেই সেই বুঝিয়া লও, আর সমস্বরে প্রাণ ভরিয়া বল,—জয় জগদ্বন্ধু হরি, জয় জগদ্বন্ধু হরি, জয় জগদ্বন্ধু হরি!! জয় তোমার পাপী-পাবন অধমতারণ জগদুদ্ধারণ লীলা!! পাঠকমহাশয় আসুন, এখন আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর মহানামে প্রেমের প্লাবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা আলোচনা করি। এই দেখুন,—চন্দ্রপাত নামক গ্রন্থে প্রভু, আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ,
চারি হস্ত চন্দ্র-পুত্র হা কীট-পতন।
(প্রভু, প্রভু, প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)।"

প্রভুর এই আত্মপরিচয়ে আমরা জানিতে পারিতেছি,—তিনি স্বয়ং শ্রীহরি। এবার তাপিত জগৎকে শান্তির বুকে তুলিয়া লইতে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বর্ত্তমান নাম,—জগদ্বন্ধু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হরিই একমাত্র পুরুষ, আর সব প্রকৃতি; এইজন্য তিনি "হরিপুরুষ।" "শ্রীহরি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। এইজন্যই তিনি মহাউদ্ধারণ।" এইজন্যই প্রভু আপনাকে "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ লিখিয়াছেন।" এখানে পাঠক-মহাশয় বলিতে পারেন,—হরি যে পুরুষ, তাহা ত সহজেই অনুমেয়, এ অবস্থায় হরিপুরুষ বলিবার তাৎপর্য্য কি, প্রভুজগদ্বন্ধুকে হরিপুরুষই বা বলা হয় কেন? হরি বলিতে ত

আর প্রকৃতি বুঝায় না ? শুধু জগদ্বন্ধু হরি বলিলেইত সব গোল মিটিয়া যাইত !

তা বটে। তবে "হরিপুরুষ" বলার গূঢ়রহস্য বা তাৎপর্য্যটি আমরা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি,—"এক কৃষ্ণ জগৎপতি আর সব প্রকৃতি।" এই কথাটি, এই ভাবটি, এই তত্ত্বটিই জীবের একমাত্র সার ও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ; ইহাতেই জীবের স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে। জীবমাত্রই প্রকৃতি বা কৃষ্ণদাসী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পুরুষ। এই তত্ত্ব ভুলিয়াইত জীব আপনি পুরুষ সাজিয়া আপনি অভিমানের পুরুষকার লইয়া 'আমি পুরুষ,' 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাদি মায়ার মিথ্যা আমিত্বে বহির্ম্মুখ হইয়া জটিলা কুটিলার মত নরক পানে ছুটিয়াছে ! জীবকে আবার অন্তর্ম্মুখীন হইতে হইলে স্বরূপে বা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, আবার আত্ম পুরুষ-অভিমান ও কর্ত্তৃত্ব ভুলিয়া, কৃষ্ণদাসী হইতে হইবে,—গোপীভাবে তন্ময় হইয়া কৃষ্ণ সেবায় নিত্যানন্দে বিভোর হইতে হইবে। জীবের এই প্রকৃতিভাবই জীবের স্বরূপ, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ ; বৈষ্ণবধর্ম্ম, জীবকে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া কৃষ্ণপতিতে অর্পণ করিতে চায়। এই নিত্য-সত্য-স্বরূপ তত্ত্বটি ভুলিয়াই আজ পুরুষ অভিমানে জীবের এই দুর্গতি ! আপনাতে পুরুষভাব থাকিতে যত বড় ভক্তই হউন না কেন, কেহই গোপীভাবের মাধুর্য্যে ডুবিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ বিকাইতে পারিবেন না। যে নিজেই পুরুষ তাঁর কি আর পুরুষের প্রেম-সম্মিলনে প্রাণ

কাঁদে ? স্বতঃই সে স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। আমরা মায়ামোহে পুরুষ সাজিয়াই কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়াছি। কিন্তু আমাদিগকে এই মহাউদ্ধারণের প্রেমের মহালীলায়—আবার প্রকৃতিভাব লাভ করিয়া স্বরূপে পৌঁছিতে হইবে।

আজ" আমাদের লুপ্ত-স্মৃতি জাগাইবার জন্য,—কৃষ্ণপতিতে মনপ্রাণ প্রধাবিত করিবার জন্য আপনাতে প্রকৃতিভাব ও শ্রীহরিতে পুরুষভাব স্থাপনের জন্য "হরিপুরুষ" মহামন্ত্রটির দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু এমনি করিয়াই মহাশক্তি সঞ্চারে আপনার হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু নামটি পাপ-তাপ-নাশন মহাউদ্ধারণ প্রকৃতি-বিনোদন করিয়া জীবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন,—"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু," "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু" মহানামরূপ মহামন্ত্রটি উচ্চারণ করিতে করিতে জীবের হরিতে পুরুষভাব ও আপনাতে প্রকৃতিভাবের সঞ্চার হইবে; 'হরিপুরুষ' মহামন্ত্রটি জপ করিতে করিতে হরিই যে একমাত্র পুরুষ, তাহা আবার হৃদয়ে জাগিবে—জীবের আবার প্রেমময় গোপীদেহ গঠিত হইবে। আবার প্রত্যেকে এই মহানামের মহাশক্তিতে প্রাণবল্লভের জন্য, অদম্য প্রেমানুরাগে, জয় জগদ্বন্ধু বলিয়া, হা প্রাণবল্লভ জগদ্বন্ধুহরি বলিয়া, হা প্রাণবল্লভ প্রাণকৃষ্ণ বলিয়া, উধাও হইয়া প্রেমময়ের প্রেমের ক্রোড়ে ছুটিয়া যাইবে! হে জগৎবাসী! তোমরা কি মধুর-রসে ভরা গোপীপদরজে গড়া রসবতী অমৃতি হইতে চাও ? চাওত অবিরত প্রেমস্বরে প্রাণভ'রে' বল,—"জয় হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।" এবার লীলা-রসময় জগদ্বন্ধুসুন্দর জীব-উদ্ধারণ

মহামন্ত্রটি চন্দ্রপাত নামক গ্রন্থে স্বহস্তে লিখিয়া জগৎবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সকলে অবিরত জপ কর, উচ্চরোলে তাণ্ডব-নর্ত্তনে লুণ্ঠনে কীর্ত্তন কর,—

"জয় হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ,
জয় হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ,
জয় হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ ॥"

যে, জীবতারণ জগদুদ্ধারণ মহামন্ত্রে জগতের উদ্ধার হইবে, তাহার আবার গোপন কি ? মহামন্ত্রে কোন গোপন নাই, কোন গোমর নাই ; প্রাণ ভরিয়া অবিরত বল, অপরকে বলাও, বন্ধুর ভবধামের লীলা, ও মহাউদ্ধারণ-ব্রত উদযাপিত হউক।

শ্রীশ্রীপ্রভু আবার আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"চারি হস্ত চন্দ্র-পুত্র হা কীট-পতন।"

এ তত্ত্বটিও আমরা এখন যথা নিযুক্তোঽস্মি ভাবে, পাঠক-মহাশয়ের গোচরীভূত করিতে চেষ্টা করিব। প্রভু আপনাকে চারিহস্ত বলিয়াছেন, কেননা, গৌরলীলার সময় মানুষ ছিল,— সাড়ে তিন হাত, ও গৌরাঙ্গ সুন্দর ছিলেন—পৌনে চারি হাত। আর এবার এই মহাউদ্ধারণ অবতারে, মানুষ হ'য়েছে পৌনে চারি হাত, এবং শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর দেহ ধারণ করিয়াছেন চারি হাত !! এইজন্যই প্রভু আপনাকে চারি হস্ত বলিয়া লিখিয়াছেন। আর এক কথা, ভগবৎ-আবির্ভাব সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ;—জীবের অজ্ঞাত। মায়ার জগৎ সে তত্ত্ব স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। যোগমায়ার প্রভাবে সে অপ্রাকৃত

আবির্ভাব অলক্ষিতভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রেমযোগ দ্বিতীয় খণ্ডে, গৌর ও গৌর-পরিকরদিগের অবতারণ সম্বন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীভগবান ত পরের কথা; মুক্ত মহাপুরুষগণও গর্ভযন্ত্রণার ভিতর দিয়া, গর্ভবাসরূপ নরকের ভিতর দিয়া কখনও সংসারে আসেন না। তাঁহাদের আবির্ভাব সম্বন্ধেও গূঢ় রহস্য বর্ত্তমান থাকে। জীবকে যোগমায়া তাহা জানিতে দেন না, কেন না, জীব, জানিতে পারিলে আর আত্মজভাবে প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হয় না।

অপ্রাকৃত শ্রীভগবানকে নিত্যধাম হইতে প্রাকৃত জগতে আসিতে হইলে, কিছু না কিছু প্রাকৃত ভাব অবলম্বন করিয়া আসিতে হয় নতুবা প্রাকৃত জীবের সহিত মিশিতে পারেন না, প্রাকৃত জগতের হাওয়াতে সর্ব্বদাই অসহ্য যন্ত্রণা পাইতে হয়। তাই গৌরের অবলম্বন,—জগন্নাথ ও শচীমাতার প্রাকৃত অঙ্গজ্যোতি, এবং শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দরের অবলম্বন প্রাকৃত চন্দ্ররশ্মি! নিমাই, জগন্নাথ ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতি অবলম্বনে আসিয়া শচীমাতার সূতিকাগৃহ আলোকিত করেন, এবং শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু-সুন্দর চন্দ্ররশ্মি অবলম্বনে আবির্ভূত হইয়া মাতা বামাসুন্দরীর অঙ্কদেশ সুশোভিত করেন। এইজন্য প্রভু আপনাকে 'চন্দ্রপুত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহাবতারী শ্রীহরি, জীবভাবে জীবজগতে আসিলেও তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ প্রাকৃত জীব-দেহের মত মৃন্ময় নহে,—পূর্ণ-চিন্ময়—পূর্ণ অপ্রাকৃত।

প্রভু, হরি-কথাতে মায়ামুগ্ধ জীবকে কীট শব্দে অভিহিত

করিয়াছেন। সেই কীটের কীটত্ব বা মায়ামুগ্ধ অবস্থার পতন (নাশ) ঘটাইবার জন্যই প্রভুর বর্ত্তমান মহাউদ্ধারণলীলা। সেই জন্য প্রভু আপনাকে কীট পতন বলিয়াছেন। "হা" শব্দটি খেদসূচক। বদ্ধজীব কীটস্বরূপ, জীবের মায়ামুগ্ধ শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিতেই প্রভু তাঁহাদের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইঁয়া 'হা!' কীট বলিয়া প্রাণের অদম্য জীবদুঃখ-কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। যে, জীবদুঃখ-কাতরতাতে, যে প্রেমোন্মাদনাতে প্রভুকে গোলোকধাম ছাড়িয়া কত কষ্ট সহিয়া জীব উদ্ধারে ভূলোকে আসিতে হইয়াছে, আজ সে প্রেমের অনন্ত মাধুর্য্যময় হৃদয়ে জীবের স্মরণমাত্রই 'হা কীট!' বলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাসে কেমন বিশ্বজনীন ব্যাকুলতা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে!! আহা আজ জীবের কি সৌভাগ্য! আজ জীবের উদ্ধারের জন্য গোলোকবিহারী শ্রীহরি জগদ্বন্ধু রূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনার পরিচয়টি—আপনার তত্ত্বাতীত তত্ত্বটি জগদুদ্ধারের জন্য জগৎ-বাসীকে জানাইতেছেন,—

"হরিপুরুষজগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন!"

আজ অনন্ত-অনন্তময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বর, একমাত্র মাধুর্য্যময় শ্রীহরি আমাদের সম্মুখে জীব উদ্ধারের জন্য জগদ্বন্ধুরূপে বিরাজ করিতেছেন! হায়, আমরা তাঁহাকে চিনিলাম না, জানিলাম না, একটিবারও প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম না, ডাকিলাম না, সেবা করিলাম না!! এমন মহেন্দ্র সুযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াও পেচকের বৃত্তি লইয়া মোহের কোঠরেই

বসিয়া রহিলাম ! হা প্রভো ! হা অনাথশরণ ! হা পাপী-পাবন ! হা মহাউদ্ধারণ ! তোমার তত্ত্বাতীত তত্ত্ব কে জানে, কে বুঝে, কাহার সাধ্য অনন্তানন্তময়ের অনন্ত প্রেমের মাধুর্য্য বিন্দুমাত্র বুঝিতে বা প্রকাশ করিতে পারে ? প্রেমের ভাষা নাই, মাধুর্য্যের ভাষা নাই, লীলার ভাষা নাই, লীলামাহাত্ম্যের ভাষা নাই ! অনন্তানন্তময় শ্রীহরিকে ব্যক্ত করার ভাষা নাই, সব অব্যয় অব্যক্ত—সব নীরব গীতি। মানুষ, মানুষের ভালবাসাটা মুখে ব্যক্ত করিতে,—মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের গুণক্রিয়া ও ভাবটুকু ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম, তা আবার অনন্তানন্তময় শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলামহিমা ক্ষুদ্রকীটাণুকীট আমরা কি বা জানি, আর কি বা প্রকাশ করিব !!

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু হরিপুরুষ। মায়াময় জগতে হরিনাম আছে, হরি,নামরূপে আছেন ; এতদ্ব্যতীত লীলা প্রচারের জন্য ইতিপূর্ব্বে হরি আর কখনও অবতীর্ণ হন নাই। কৃষ্ণ আসিয়াছেন, রাধা আসিয়াছেন, সখাসখী সবই আসিয়াছেন, হরি আসেন নাই। রাধা-কৃষ্ণ, ললিতা প্রভৃতি একাধারে গৌর আসিয়াছেন, শব্যা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি একাধারে নিতাই আসিয়াছেন, সমস্ত সখাসখী গৌরপরিকররূপে আসিয়াছেন, হরি আসেন নাই। হরি কে ? রাধা-কৃষ্ণ ও সখা-সখী সর্ব্ব সমবায়ে হরি। হরি বলিলে গোলোকের সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। সম্রাট্‌ আসিতেছেন বলিলে যেমন তাঁহার স্ত্রীপুত্র ও পারিষদবর্গ তদন্তর্গতই বুঝায়, সেইরূপ হরি বলিলেও রাধা-কৃষ্ণ, নিতাই-গৌর, এবং ব্রজলীলা ও গৌরলীলার সর্ব্বসমষ্টি বুঝিতে হইবে। সেইজন্য বলিয়াছি

কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, রাধা আসিয়াছিলেন, ললিতা, বিশখা, শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন, আবার একাধারে পঞ্চমিলনে নিতাই গৌরও আসিয়াছিলেন, কিন্তু একাধারে সর্ব্বসম্মিলনে শ্রীহরি আর কখনও আসেন নাই। এবার জগতের মহাউদ্ধারণে সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বলীলামাধুরী সমবায়ে শ্রীশ্রীহরি-পুরুষ জগদ্বন্ধু সুন্দর আসিয়াছেন। কৃষ্ণলীলায় পৃথক্ পৃথক্ এক একটি আসিয়া করিলেন,—প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন, গৌরলীলায় পঞ্চসম্মিলনে আসিয়া করিলেন,—প্রেম বিতরণ, এবার একাধারে সর্ব্বসম্মিলনে 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ' —একেবারে বিশ্বময় প্রেমের প্লাবন! এবার যেমন সমস্ত জগৎময় মহাপ্রলয়, সমস্ত জগৎময় অধর্ম্মের প্রশ্রয়, তেমন, সর্ব্বসম্মিলনে মহাবতারী জগদ্বন্ধুর অভ্যুদয়! শ্রীহরি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মাধুর্য্যময় ঈশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি প্রভৃতি আর সমস্তই তাঁহার বিভূতি মাত্র। সুতরাং যখনই পূর্ণাবতারী শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন, তখনই ব্রহ্মাদি যাবতীয় বিভূতি তাঁহার লীলার সহায়তার জন্য অনুগামী বা অঙ্গীভূত হইয়া থাকেন। এবার পূর্ণাবতারী শ্রীহরি আসিয়াছেন, কাজেই যাবতীয় বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যময় শক্তিই শ্রীশ্রীপ্রভুর অঙ্গীভূত হইয়াছেন। অতএব জগৎবাসী, আজ নিজ নিজ ভাব অনুসারে প্রভু জগদ্বন্ধুতে সবই পাইবে, সমস্ত রূপই দর্শন করিয়া ধন্য হইবে, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান কাহারও বাসনা অপূর্ণ থাকিবে না।

এবার জগৎ-উদ্ধারণের জন্য, জগদুদ্ধারণ-মহামন্ত্র—জগদ্বন্ধু

নাম। জগদ্বন্ধু নাম—মহানাম। হরিনাম উচ্চারণ করিলে, রাধাকৃষ্ণ, নিতাই গৌর প্রভৃতি সব নামই যেমন উচ্চারণ করা হয়, তেমন জগদ্বন্ধু নাম উচ্চারণ করিলে, হরিনাম, রাধাকৃষ্ণ নাম, নিতাইগৌর নাম, উভয়লীলার যাবতীয় পরিকরের নাম, এবং বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যময় যাবতীয় ভগবান-ভগবতীগণের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করা হইয়া যায়। কেন না মহাবতারী জগদ্বন্ধুর একাধারেই সর্ব্ব-সম্মিলন।

শ্রীশ্রীপ্রভু, ত্রিকাল-গ্রন্থে আপনার জগদ্বন্ধু নামকে মহানাম এবং এই মহানামের মহাশক্তিকে চতুর্দ্দশ-মর্দ্দলন বা চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন তুল্য লিখিয়াছেন। চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তনে যে ফল, একবার জগদ্বন্ধু মহানামটি উচ্চারণ করিলেও সেই ফল হয়। আমরা কলির জীব যেমন মহাপাপী, তেমন আমাদের পরিত্রাণের জন্য এবার চতুর্দ্দশ মর্দ্দলন তুল্য মহাউদ্ধারণ নাম! এই মহানামই এবার জীব-উদ্ধারণ মহামন্ত্র। ভাই! প্রভুকে বিশ্বাস করিলে, প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য ও শ্রীহস্তের লিখিত তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অভ্রান্তরূপে বিশ্বাস করিবে। গৌর, নিজের নাম করিতে নিষেধ করিলেও, যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারা গৌরের নিষেধ না মানিয়াই, তাঁহার নাম ও লীলা-মহিমা গান করিয়াছিলেন। আর এবার শ্রীশ্রীপ্রভু গোপন থাকিতে চেষ্টা না করিয়া, নিজের পরিচয় নিজ হাতে লিখিয়া জগৎকে দিয়াছেন, তদুপরি ত্রিকাল গ্রন্থে, নিজের নামমাহাত্ম্যকে চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন তুল্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন! ইহাতেও কি আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবে না!

গৌরভক্ত গৌরের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার নাম করিয়া-ছিলেন, আর এবার বন্ধু-ভক্তগণ কি বন্ধুর হাতের লেখা রেজেষ্টারী করা পাকা দলিল পাইয়াও সেদিকে লক্ষ্য করিবেন না! প্রভু এবার জীব-উদ্ধারে আসিয়া আপনাকে জীবের দ্বারে দ্বারে বিনামূল্যে বিকাইবার জন্য, আত্ম-তত্ত্ব নিজমুখে বলিয়াছেন, নিজহাতে লিখিয়া জানাইয়াছেন, জ্যোতিষী দ্বারা গণনা করিয়া দেখিতে পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, তবুও কি আমরা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিব না? জীবের জন্য তাঁহার এত ব্যাকুলতা, জীবকে ধরা দিতে তিনি এত ব্যস্ত, তবু কি আমরা তাঁহার মহাউদ্ধারণের শান্তিময় কোলে ছুটিয়া যাইব না? তবু কি তাঁহার মহানামের মহারোলে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া নিত্যানন্দময় শান্তির সাগরে নিমজ্জিত হইব না?

হায়! বহির্ম্মুখ জীবকে অন্তর্মুখীন করিবার জন্য প্রত্যেক অবতারেই ভগবান পূর্ব্বতন ভাবটি সম্মুখে ধরিয়া বর্ষিতে টোপ দেওয়ার মত সংস্কারবদ্ধ নর-মীনগুলিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। সেই জন্যই গৌর, পূর্ব্ব প্রচারিত ভাব অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব রেজেষ্টারী করা "রাধা কৃষ্ণ" নামই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সকাম স্বার্থপর জীবকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আপনি জীব ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট রক্ষমাং রক্ষমাং পাহিমাং পাহিমাং রবে করুণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌর, কোন দিনই গৌর নাম বা নিতাই নাম করিতে বলেন নাই। পরে গৌর-পাকর যখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন গৌরের নিষেধ সত্ত্বেও আপনারা গৌর-কীর্ত্তন

আরম্ভ করিলেন। এবার শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরও জীবকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া টানিয়া আনিবার জন্য পূর্ব্ব রেজিষ্টারী করা নিতাই-গৌর লীলা ও রাধা-কৃষ্ণ লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিয়া শ্রীমতী সংকীর্ত্তন ও হরিকথা এবং আপনার মহালীলা-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক চন্দ্রপাত ও ত্রিকাল-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠক ভায়া আপনি কোন্ দিকে যাইবেন? গৌর-ভক্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াও গৌরের বর্ত্তমান সাক্ষাৎ-লীলারসামৃত পান করিয়াছিলেন। আর আপনি শ্রীশ্রীপ্রভুর নিজের ঘোষণা সত্ত্বেও কি বর্ত্তমান লীলারসামৃত পান করিয়া ধন্য হইবেন না? আপনি, নিতাই-গৌর নাম করুণ, রাধা-কৃষ্ণ নাম করুন সে ত ভাল কথা, তাহাতে আমরা নিষেধ করিতেছি না, বরং প্রাণপণে উৎসাহ দিতেছি, কিন্তু বর্ত্তমান লীলারসে বিভোর হইতে চাহিলে, বর্ত্তমান লীলারসময়কে বিশেষ ভাবে ধরিতে হইবে। গৌর-পরিকরদিগের মত বর্ত্তমান বিকাশে অতীত লীলারস আস্বাদন করিয়া বর্ত্তমানকেই বিশেষ ভাবে আলিঙ্গন করিতে হইবে। বর্ত্তমান অভিনব লীলা-মাধুর্য্যে ডুবিয়া যাইতে হইলে, বর্ত্তমান মহাবতারীকেই, দৃঢ় আলিঙ্গনে—গোপীদের কৃষ্ণরসে ডুবিয়া যাইবার মত—অতলে ডুবিতে হইবে! বর্ত্তমানকে ধরিতে পরিলেই ইঁহার ভিতরে অতীত লীলারস পূর্ণ মাত্রায় পান করিতে অধিকারী হইবে। নতুবা বর্ত্তমান বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে অতীতও বাদ পড়িয়া যাইবে। কেননা অতীতের পূর্ণ বিকাশই বর্ত্তমান। আর মনে করিও, তুমি গোপী হইলেও যেমন এখন গোপী নও, অবস্থার পরিবর্ত্তনে, রাম, শ্যাম, যদু,

তোমার কৃষ্ণও তেমন এখন জীব উদ্ধারণে জগদ্বন্ধু। এখন তোমাকে নবলীলার নবরসামৃতে ডুবিতে হইলে গৌর-পরিকর-দিগের মতই পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিয়া জগদ্বন্ধুকে প্রাণবন্ধু, প্রাণবল্লভ বলিয়া তাঁহার প্রেমের বুকে ছুটিতে হইবে। নতুবা নবযুগের নবপ্রেমের প্লাবনে সাঁতার খেলিতে পারিবে না। আবার প্রকট লীলা অবসানে ভাগ্যে থাকিলে, নিত্য গোলোকে তুমি গোপী তিনি কৃষ্ণ; অনন্তকাল বংশীতান, রাসমিলনে প্রেমের গান! অনন্তরাস-রস পান!! এখন তোমার কানাইয়া হ'য়েছেন চাঁদের কিরণ ছানিয়া, কাঞ্চন জিনিয়া জ্যোতির্ম্ময় নেংটা দিগম্বর, জগদ্বন্ধু সুন্দর; তুমি হইয়াছ, প্রাকৃত জীব—নগেন্দ্র খগেন্দ্র মহেন্দ্র ইত্যাদি। বাঁশীস্বর হ'য়েছে—করতাল মাদল গর্জ্জন, রাসলীলা হ'য়েছে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন! এবার তিনিও তিনি নাই, তুমিও তুমি নাই। সে লীলাও নাই, সে ভাবও নাই, আবার সবই আছে! রূপান্তরে সবই আছে, সবই হইতেছে! কাজেই তোমাকেও এই রূপান্তরে ও ভাবান্তরেই সব করিতে হইবে। নতুবা, পরপুরুষ দৃষ্টে পর নারীর মত দূরেই মুখ গুঁজিয়া থাকিতে হইবে,—এই মহাউদ্ধারণের বিশ্বময় রসের প্লাবন হইতে বঞ্চিত হইয়া তোমাকে চড়ায় পড়িয়া কাঁদিতে হইবে। তিনি জীব-উদ্ধারে আসিয়াছেন, তিনি ত, সকলকেই উদ্ধার করিবেন, তোমার লক্ষ্য কি ঐ উদ্ধার পর্য্যন্ত!! তুমি কি শুধু উদ্ধার হইতেই চাও? নাকি, তাঁহার নব-যুগ-প্রবর্ত্তনায় নবরসের অমৃতময় প্লাবনে ডুবিয়া অমৃতি হইতে চাও! ভাই বর্ত্তমান দেহ-মন-প্রাণ লইয়া বর্ত্তমান

বিংশ শতাব্দীতে, পৃথিবীতে বসিয়া সুদূর অতীতের ভাবনা ভাবিয়া ফল নাই। বর্ত্তমানকে ধর, বর্ত্তমান লীলা-মাধুর্য্যে ডুবিয়া যাও, অতীতের যাবতীয় ভাব, রাগ, রূপ, রসই নূতনের ভিতরে বুঝিয়া পাইবে। পুরাতনে আবার আরও নূতন কত কি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া পাইয়া, আপনি খাইয়া, জগৎকে বিলাইয়া হাসিয়া ভাসিয়া নাচিয়া গাহিয়া সদানন্দে বিভোর হইয়া যাইবে। অতএব ভাই গৌর-পরিকরদিগের মত, বর্ত্তমান রূপে, রসে, নামে, প্রেমে ডুবিয়া যাও, যাহা কখনও পাও নাই, পাইবে বলিয়া কল্পনাও করিতে পার না, তাহাই পাইবে; নিত্য প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া যাইবে। গৌর-পরিকর, নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বর্ত্তমানকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল, আর তোমরা কি প্রভুর আদেশ, উপদেশ এবং ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে? এ সম্বন্ধে নিম্নে আমরা একটি ভক্তের অনুভূতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি! ফরিদপুর—রাজবাড়ী নিবাসী পরমভক্ত শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দাস মহাশয়, একদিন, শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় এই অপূর্ব্ব তত্ত্বটি জানিয়াছিলেন। তিনি স্বপ্নযোগে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দর্শন পাইয়া, চরণে লুন্ঠিত হইয়া পড়িতেই, প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—তুই এখনও নিতাই নিতাই, গৌর গৌর করিস্? এত দে'খ্‌লি এত জান্‌লি তাহাতেও আমাকে বিশ্বাস হইল না, আমার মহানামে বিশ্বাস হইল না? রামগোবিন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন—যাঁহারা নিতাই, গৌর, রাধাকৃষ্ণ ভজে, তাঁহারা ক তোমাকে পাইবে না? তুমি কি গৌর নও? তুমি কি কৃষ্ণ

নও? শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, আমি সবই, কিন্তু তবুও তত্ত্ব অনেক প্রভেদ। বর্ত্তমান ও অতীতের নাম, রূপ, ভাব, লীলা সব বিষয়েই প্রভেদ। যাহারা নিতাই গৌর ভজনা করিতেছে, তাহারাও আমাকে পাইবে, তবে, অনেক ঘুরিয়া!! আমরা এস্থলে ভক্ত-প্রবর রামগোবিন্দ বাবুর স্বপ্ন বৃত্তান্তটিতে প্রভুর শ্রীমুখের উপদেশটি জানিতেছি,—জানিতেছি—বর্ত্তমান লীলা মাধুর্য্যে ডুবিতে না পারিলে, অতীতের ভাব লইয়া, অতীতের রূপ লইয়া, অতীতের নাম লইয়া সহজে সাক্ষাৎ রসময়ের রসের সমুদ্রে ঝাঁপিয়া পড়া যায় না! গৌরের ভজন করিতে বসিয়া যেমন কৃষ্ণনাম জপ ও কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিলে হয় না, গৌরের ভজন করিতে হইলে গৌরনামে, গৌররূপে ও গৌরলীলায়ই ডুবিতে হয়, এবং গৌরের লীলা-রসে ডুবিলে যেমন কৃষ্ণলীলার যাবতীয় তত্ত্বে ও যাবতীয় রূপ-রসে ভরপূর হওয়া যায়, তেমন, বর্ত্তমান লীলামাধুর্য্যে—হরিপুরুষের রূপে, রসে, নামে, প্রেমে মত্ত হইলে, অনায়াসে বর্ত্তমানের ভিতরেই অতীতের যাবতীয় লীলারসও সম্ভোগ হইয়া যাইবে। এস ভাই! আর চিন্তা কি, মলিন মুখ কেন? এত সঙ্কোচই বা কেন? প্রভুর শ্রীহস্তের লেখা দেখ, শ্রীমুখের বাণী শুন, আর তাঁহাতে —সেই প্রভু বাক্যে—তাঁহার মহাউদ্ধারণ লীলায় অগাধ বিশ্বাস করিয়া প্রাণ ভরিয়া বল—জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় জগদ্বন্ধু হরি!! জয় জগদ্বন্ধু হরি!!!

এই মহানাম করিতে গেলে অন্যে বিরক্ত হইবে, অন্যে নিন্দা করিবে, সে ভয় দূর কর! বহির্ম্মুখ জীব, চিরদিনই কৃষ্ণ

নামে ক্ষেপিয়া উঠে। দেখ নাই কি, কৃষ্ণ নাম দিতে যাইয়া নিতাইও মা'র খাইয়াছিলেন, কৃষ্ণনাম করিতে যাইয়া গোপীগণ কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতেন, আর তোমার প্রতি লোকে না হয় একটু বিরক্তই হইল! আজ যে বিরক্ত হইবে, কাল আবার সে ঐ মহানামের মহাউদ্ধারণ শক্তিতে ছুটিয়া আসিয়া ধূলায় পড়িয়া লুটাইবে! বল,—জয় জগদ্বন্ধু হরি! যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ, প্রভু, দয়া করিয়া যে নাম, চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন তুল্য বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন, সেই একমাত্র জগদুদ্ধারণ মহামন্ত্র—মহানাম উচ্চারণে সঙ্কোচ করিবে কেন? বিরত হইবে কেন? ঐ দেখ না—রাস্তা দিয়া কেহ 'তারা' বলিয়া, কেহ 'জয় কালি' বলিয়া, কেহ 'আল্লা' বলিয়া, কেহ 'যীশু' বলিয়া নিজ নিজ ভাবে চলিয়া যাইতেছে; অপরে বিরক্ত হইবে বলিয়া কি কেহ, নিজ ইষ্ট নাম উচ্চারণ করিতে বিরত হয়? না কি অন্যের নিন্দা কুৎসার ভয় করে? তবে তুমি তোমার ইষ্টনাম—ভুবন মঙ্গল মহানাম, জগদুদ্ধারণ একমাত্র মহামন্ত্র জগদ্বন্ধু নাম করিতে বিরত থাকিবে কেন? বল—প্রাণ ভরিয়া যথা তথা, যেখানে সেখানে, জয় জগদ্বন্ধু হরি! প্রভু ত আদেশ দিয়াছেন—"যেখানে সেখানে আমার কথা ব'লবি,—আমি ঝুঁটা মাল নই যে বল্‌তে ভয় ক'র্‌বে। একটা মেটে হাঁড়িও যখন মানুষ তিনবার বাজাইয়া কিনে, তখন আমাকে না বাজাইয়া গ্রহণ করিবে কেন? পৃথিবীর সকলকে বলিস্ তাঁহারা যেন মহা মহা জ্যোতিষী দ্বারা আমার বিষয় গণনা করিয়া দেখে, সত্য হ'লে যেন আমায়

গ্রহণ করে, নৈলে দূরে পরিহার করে।” ধন্য প্রেমময়ের অযাচিত করুণা !! জীবকে ধরা দিবার জন্য কত ব্যাকুলতা, কত যেন দায় ঠেকা, জীবকে যেন ধরা না দিলেই নয় !! ভাই আমরা কি প্রভুর কথা উপেক্ষা করিব, আমরা কি ঝুটা মাল লইয়া ফেরি করিতে বাহির হইয়াছি ? আমরা কি প্রভুর আদেশ উপেক্ষা করিব, আমরা কি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যেখানে সেখানে যাঁর তাঁর কাছে প্রভুর অভয়বাণী ও মহানাম ঘোষণা করিতে পারিব না ? লোকে শুনুক্ বা না শুনুক্, চা'ক্ বা না চা'ক্, জগৎ ভরিয়া আমাদিগকে জগদুদ্ধারণ মহানাম ঘোষণা করিয়া মহাউদ্ধারণের মহালীলা-রসে ডুবাইতে হইবে, ডুবিতে হইবে। লোকে ঝুটা মালকে আসল বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করিতে পারে, আর তুমি আসল জিনিসকে আসল বলিয়া লোকের কাছে ধরিতে পারিবে না ? জগদ্বন্ধু মহানামে আপনি ধন্য হইয়া, অষ্ট-পাশ-মুক্ত হইয়া জগৎকে ধন্য করিতে পারিবে না ; জগৎকে অষ্ট-পাশ-মুক্ত করিয়া প্রেমের মন্দিরে নিত্যানন্দে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে না ? ভয় কি ? চিন্তা কি ? ঐ যে প্রাচীন ভক্ত গাহিয়াছেন, প্রাণ ভরিয়া ঐ তানে তান মিলাইয়া—

“জগদ্বন্ধু নাম গাও নিশিদিনে,
পূর্ণ হ'বে কাম, অন্তে মোক্ষ ধাম,
পাবিরে ঐ নামের গুণে।”

ভ্রাতৃগণ ! তোমরা ভাবে ডুবিয়া—রসে বিভোর হইয়া অবিরত মহানাম কর ! নামই এবার মহাউদ্ধারণের বিশ্ব-

বিজয়ের মহা-অস্ত্র! মহানামে অচিরেই মহাপ্রেমের বন্যায় জগৎ ডুবিয়া যাইবে। আপনি আপনার ভাবে নাম কর; অপরকেও তাঁহার ভাব অনুসারে হরেকৃষ্ণ নাম ও নিতাই গৌর নাম করিতে উৎসাহ দাও। খবরদার কাহাকেও নামে উৎসাহ ভিন্ন বাধা দিও না, এবং সঙ্গে সঙ্গে জগদুদ্ধারণ জগদ্বন্ধু মহানামটি কাণে দিতেও ছাড়িও না! সর্ব্বত্রই নামে উৎসাহ দান কর। যাহাতে অবিশ্রান্ত নাম হয় তাহাই কর, যতই নামের রোল উঠিবে, যতই নাম সংকীর্ত্তনের জয় হইবে, যতই হরিনামে জগৎ প্লাবিত হইবে, ততই জগতের অষ্টপাশ নাশ হইবে,—বন্ধুর মহা প্রকাশের সময় নিকটবর্ত্তী হইবে,—মহা-উদ্ধারণের মহালীলার কার্য্যও উদযাপিত হইবে।

আজকাল, নব্য-শিক্ষিতগণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকে অসভ্যতা বলিয়া থাকেন। অনেকে বলেন, 'যদি নাম করিতেই হয়, তবে, না হয় 'মনে মনেই করিলে, অসভ্যের মত লাফাইয়া দরকার কি?'

আমরা বলি, উকীল বাবু প্রথম প্রথম যখন, দুই চারিটি মুখস্থ গদই আওড়ান, তখন অতি সন্তর্পণে, মুখ দিয়া বাহির হয় কি না হয়! তৎপর ক্রমে ভাব আসিলে, চীৎকার করিয়া, হাত নাড়িয়া, পা নাড়িয়া, টেবেল চাপড়াইয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া ভাবের তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া আসর মাত করেন। তখন আর লজ্জা-সঙ্কোচের দিকে মন থাকে না! মহানামের মহাভাবে, মানুষ এইরূপ ক্রমে তন্ময় হইয়া অবিরত হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, ধূলাতে গড়াগড়ি যায়! যদি ভাবই না আসিল, তবে ভাবহীন ভাষার মত, প্রাণহীন দেহের মত, ভাব-রাগ-

রস-হীন অবস্থায় নাম করিলে তেমন প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস হয় কৈ? মানব-জগৎ ভুলিয়া প্রাকৃত রাজ্য ছাড়িয়া অপ্রাকৃত প্রেমের দেশে যাওয়া ঘটে কৈ? প্রেমময়ের দর্শন স্পর্শন হয় কৈ? তাই বলি, সভ্য বাবুগণ, সাপের মন্ত্র পড়ার মত শুধু নাম করার উপদেশ দিবেন না, উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের লাফালাফি দেখিয়া যদি বাবুদের লজ্জাই হয়, তবে নয় চক্ষু মুদিয়াই অন্ধকার দর্শন করিবেন; না জানিয়া শুনিয়া উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনের নিন্দা করিয়া পরকালের পথে ভাল করিয়া কাঁটা দিবেন না!! শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছেন—"অষ্টাঙ্গে নতি,—লুণ্ঠন এবং ঊর্দ্ধবাহু করিয়া উচ্চ-নৃত্যসহ মহাপ্রভুর স্বরূপ কীর্ত্তন, স্মরণ, সন্নিধান করিলে উচ্ছ্বাস—আনন্দ—ভাব—ভক্তি—প্রেম ইত্যাদি হইয়া থাকে।" আর এক স্থানে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন, তুঙ্গ-তুমুল-নর্ত্তন,
প্রদক্ষিণাবলুণ্ঠনে মজ॥

অতএব আমাদিগকে লজ্জা ও সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বন্ধুবাক্য অনুসারে ঊর্দ্ধবাহু করিয়া উচ্চ-নৃত্য সহকারে কীর্ত্তন' করিতে হইবে। নামে পাগল হইতে হইবে, প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চ-নর্ত্তনের সহিত কীর্ত্তন করিতে হইবে। নামে পাগল হইয়া কখনও নাচ, কখন কাঁদ, কখনও অষ্টাঙ্গে পড়িয়া নমস্কার কর,—মহা-সংকীর্ত্তনরূপ মহারাসের মহারজে প্রাণ ভরিয়া গড়াগড়ি দাও, কখনও ছুটিয়া ছুটিয়া করতালি দিয়া প্রদক্ষিণ কর, প্রেম—আনন্দ উথ'লে উঠিবে! নামের সহিত নামীকে পাইয়া নিত্যানন্দে বিভোর হইয়া যাইবে। আজকাল অনেকেই, লম্বা

কোচা ঠিক রাখিয়া, চাঁদের টিপ কাটা রস-কলি তিলকটি বজায় রাখিয়া গায়ে ধূলি না লাগাইয়া, যেন-তেন প্রকারে এক আধ-টুকু কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তন একেবারে না করার চেয়ে এটি ভাল হইলেও বাস্তবিক এরূপ কীর্ত্তনে প্রেমানন্দের উদয় হয় না, নামের সহিত নামীর দর্শন লাভ ঘটে না! অতএব উল্লিখিত প্রভুবাক্য স্মরণ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু করিয়া নর্ত্তনে লুণ্ঠনে—'নাম করিবার মত' নাম করিতে হইবে। ভাবে ডুবিয়া উচ্চ নৃত্য সহকারে নাম করিবার মত নাম করিলে প্রেম, আনন্দ, শান্তি উথ'লে উঠে, নামের সহিত নামীর দর্শন স্পর্শন ঘটিয়া থাকে।

প্রভু বলিয়াছেন—"নাম গ্রহণে সবার সমান অধিকার—ইহাতে নাই জাতিকুল বিচার।" তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, খৃষ্টান হও, যে হও, এস হরিনামে কাহারও বাধা নাই। তুমি বালক হও, বৃদ্ধ হও, যুবক হও, যে হও, এস, হরিনামে সকলেরই সমান অধিকার। কখনও স্মরণ, মনন, জপন, কখনও উচ্চ-কীর্ত্তন, যে সে প্রকারে সর্ব্বদাই হরিনামে ডুবিয়া থাকিবে। এইরূপ ভাবে অবিরত প্রাণ ভরিয়া হরিনাম করিলে—হরিনামে ডুবিয়া থাকিলে, প্রাকৃত জীবেও অপ্রাকৃত ভাবের সঞ্চার হয়। অপ্রাকৃত ভাবের সঞ্চার হইলেই অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন, স্পর্শন, ও সেবা করিবার অধিকার ঘটে। তখন সে গোলোকের নিত্যলীলা, প্রকট-ব্রজলীলা, নবদ্বীপলীলা সব সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়!—লীলায় ডুবিয়া লীলারসে বিভোর হইয়া যায়! তুমি আমি যেমন

কথা বলি, আলিঙ্গন করি, চুম্বন করি, কত ভালবাসার ভাবে মুগ্ধ হই, সেও এই মানব দেহেই—এই নশ্বর জগতেই সেইরূপ প্রেমময়ের প্রেমলীলায় ডুবিয়া প্রাণবল্লভের দর্শনে, স্পর্শনে, আলিঙ্গনে, সেবনে সর্ব্বদা আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে। ভাই! তুমি কি সেই অপ্রাকৃত অবস্থায় পৌঁছিয়া অপ্রাকৃত প্রেমময়কে প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া দেহ-মন-প্রাণ চরিতার্থ করিতে চাও? চাওত অবিরত হরিনামে ডুবিয়া যাও, তুমি যত পাপই করিয়া থাক না কেন, সেদিকে ফিরিয়া চাহিও না। হরিনামের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইয়া যায়। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তন ও প্রভাতি কর্‌লে, মনের ময়লা দূর হইয়া যায়। মানুষ ছাপ সাদা বরফের মত হয়। সঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে মানুষ সব ভু'লে যায়, নিজকেও খুঁজে পায় না।" এই বরফের মত সাদা ধপ্‌ধ'পে অবস্থা ঘটিলে, মানুষ যখন এই কামময় প্রাকৃত জগতে আপনাকেও খুঁজিয়া পায় না, তখন, সে অপ্রাকৃত অবস্থায় পৌঁছিয়া প্রেমময়ের প্রেমানন্দে ডুবিয়া থাকে। প্রেমানন্দে মাতিয়া সর্ব্বদা হাসে, কাঁদে নাচে গায়—আনন্দে গড়াগড়ি যায়। এই অবস্থা ঘটিলে মানুষ ভূলোকেই গোলোক বিহারীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ও সেবার অধিকারী হইয়া থাকে। আজ মহা-উদ্ধারণের প্রেমের প্লাবনে ডুবিয়া যাইবে ত, সকলেই হরি হরি বলিয়া—জয় জগদ্বন্ধু বলিয়া—অবিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাসের পেচকের অন্ধকার কোঠর হইতে ছুটিয়া এস!! কাহারও বাধা নাই, মহা-উদ্ধারণের প্রেমের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে কাহারও নিষেধ নাই! পতিতের বন্ধু আমাদের মত

পতিতের জন্যই আসিয়াছেন, পাপীর বন্ধু আমাদের মত পাপী-তাপীর জন্যই আসিয়াছেন, জগদ্বন্ধু পতিত-জগতের উদ্ধারণেই আসিয়াছেন!! এই দেখ তিনি জীবকে আশ্বাস দিবার জন্য নিজে জীবভাব অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন—

ধনে প্রাণে কায়মনে, সকল অরাতি সনে,
বিকাব রাতুল পদতলে।
(বিকাইব রে) (ছয় শত্রু পাপ লয়ে)।

আর চিন্তা কি? প্রভু বলিয়াছেন, ষড়রিপু ও পাপতাপ লইয়া শ্রীহরির রাতুল পদতলে বিকাইতে হইবে। এইত পাপীতাপীর জন্য মহাউদ্ধারণের মহাঅভয়বাণী!! বাস্তবিকই শিশু যেমন মলক্লেদ মাখিয়াই পিতামাতার প্রেমের ক্রোড়ে উধাও হইয়া ছুটিয়া যায়, আমরাও সেইরূপ ষড়রিপু ও পাপ-তাপ যাহা কিছু আছে, সব লইয়াই হরি হরি বলিয়া—জয় জগদ্বন্ধু বলিয়া তাঁহার প্রেমের ক্রোড়ে ছুটিয়া যাইব! ইহাই এই মহা-উদ্ধারণ লীলায় প্রেমময়ের প্রেমের আহ্বান!! তিনি পাপী তাপীকে ডাকিতেছেন—তোদের পাপতাপ চিন্তা করিতে হইবে না, যত পাপতাপই থাকুক্ না কেন সব লইয়া উধাও হইয়া ছুটিয়া আয়!! আহা! কি প্রাণারাম আশ্বাসবাণী!! জীবের আজ কি শুভ মহেন্দ্রযুগ সমুপস্থিত!! এইরূপে জীব, প্রেমময়কে না পাইলে, সে কি শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া পরে, ভগবানের কাছে আসিতে পারে? জীবের কি সে শক্তি আছে? মায়ামুগ্ধ পতিত জীবের কি সে ক্ষমতা আছে? পতিত জীব কখনও আপনার বলে শুদ্ধ, সত্ত্ব ও মুক্ত হইয়া ভগবৎ-চরণে স্থান

পাইতে পারে না। সকলকেই হরি হরি বলিয়া অবিচারে প্রেমময়ের প্রেমের ক্রোড়ে ছুটিয়া আসিতে হইবে। চাই প্রাণের ব্যাকুলতা! আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জয় জগদ্বন্ধু বলিয়া—হা জগদ্বন্ধু বলিয়া ছুট! বালকের মত মলমূত্র গায়ে মাখিয়াই ছুট, মুহূর্ত্তেই দেখিবে, সোহাগের শিশুর মত নির্ম্মল ও পবিত্র দেহে প্রেমময়ের প্রেমের ক্রোড়ে কত আদরে স্থান পাইয়াছ !! কেহ মনে করিও না,—তুমি অনশনব্রত ধরিয়াছ, বা শুধু শাক্‌সব্জি গাছপালা খাইয়া কাটাইতেছ বলিয়া, তুমিই তাঁহার বেশী আদরের। আজ যে গো-খাদক ম্লেচ্ছ, 'জয় জগদ্বন্ধু' বলিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতার কাছে হয়ত, তোমার মত কত অনশন ব্রতাবলম্বী, হতভম্বের মত হা করিয়া চাহিয়া থাকিবে, তাঁহার বক্ষ-প্লাবিত অশ্রুধারে তোমার মত কত শাকভোজী হয় ত বিহ্বল হইয়া হাবুডুবু খাইবে! তাই বলিয়া কেহ মনে করিও না, আমরা ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতেছি। আমরা, মহাউদ্ধারণের জয় ঘোষণা করিতেছি, মহাউদ্ধারণের মহালীলায় এবার এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারই সংঘটিত হইবে, এইরূপ প্রেমের জয়ই সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে। তুমি প্রেমিক হও, ভক্ত হও, ব্রহ্মচারী হও, সাধন ভজন করিয়া অনেক অগ্রসর হইয়া থাক, সিদ্ধ হইয়া থাক, বা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত অবস্থা লাভ করিয়া থাক, ভাল কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ ভক্তাভিমান হৃদয়ে পোষণ করিও না। অভিমানেই পতন। কাহারও অভিমান না আসিতে পারে, সেইজন্য প্রভু পূর্ব্বেই ভক্তগণকে বলিয়া রাখিয়াছেন,"তোরা আমার কেউ না।

দুনিয়ার মহাপাপী ভেসে যাচ্ছিল, ধরেছি বলে আছিস্। * * দেখ্‌বি, সময়ে এমন সব লোক আমার কাছে আস্‌বে, তোরা দে'খে অবাক্ হ'য়ে যাবি! * * তারা আর তোরা সমুদ্রের এপার আর ওপার তফাৎ!! তাদের ভক্তি, বিশ্বাস, তেজঃ অটল। তারা হরিনামের জন্য,—ভুবন মঙ্গল হরিনামের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'র্‌বে। দিন রাত হরিনামে মেতে থা'ক্‌বে, তোরা ফেল্ ফেল্ ক'রে চেয়ে থাক্‌বি।" অতএব কেহ অভিমান করিও না,—আমি, এতকাল কঠোর নিয়ম করিয়াছি, আমি নিরামিষ খাইয়াছি, আমাকে আর পায় কে, প্রভুত, আমার হাতের মুঠে! "আর ওসব, দুই দিনের যুগী ভাতেরে কয় অন্ন"। শুধু নিরামিষ খাইলেই ভগবান লাভ হয় না। পশ্চিমদেশীয় বহুলোক চিরদিনই নিরামিষ খায়, পশু চিরদিন ঘাসই খায়, অনেক পক্ষী চিরদিনই ফল খায়, উদ্ভিদ্ চিরদিন মাটির রসই খায়, তাই বলিয়া কি তাহারাই শুধু ভগবানকে পাইবে? ভগবান প্রেমের পুতুল, প্রাণের ব্যাকুলতার ধন। ব্যাকুল ভাবে প্রেমবিগলিত হৃদয়ে ডাক্‌লে মিলে, কাঁদ্‌লে দেখা দেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুতে পাওয়া যায় না। ঐ যে আমরা প্রেমিকের প্রেম-বিগলিত করুণকণ্ঠে শুনিতে পাই—

নিত্ নাহ্-নে সে হরি মিলেতো জল জন্তু হোই।
ফল মূল খাকে হরি মিলেতো বাদুর বাঁদরাই॥

* * * * *

"দুধ্ পিকে হরি মিলেতো বহুত বৎসবালা,
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা!!"

প্রেম ভিন্ন নন্দলাল আর কাহারও নয়! অবিরত স্নান ক'রলেও মিলে না, ফলমূলভোজী হইলেও মিলে না, শুধু দুধ খাইলেও পাওয়া যায় না, আর শুধু গাছপালা খাইলেও মিলে না। তাঁহাকে বাদ দিয়া শুধু ফলমূল আহারী বা শাক-পাতাভোজী হইয়া জীবনযাপন করা বাদুর বাঁদরাই ও ছাগ মহিষের ব্যবহার ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রেমময় শ্রীহরি শুধু প্রেমেই লাভ হয়। প্রভু বলিয়াছেন—"আমি কেবল হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই।" ঠিক কথা প্রেমময় হরি, শুধু প্রেমেমাখা হরিনামেই লাভ হয়, হরিনামেই হরি মিলে আর কিছুতে মিলে না। ভাই তুমি যে হও সে হও, আকুল প্রাণে হরি হরি বলিয়া ছুটিয়া এস, অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জয় জগদ্বন্ধু বলিয়া মলক্লেদ-লিপ্ত শিশুর মত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, আবেগভরে ছুটিয়া এস! ঐ যে জগদ্বন্ধু তোমার ও আমার মত পাপী-তাপীর জন্য;—জগজ্জীবের জন্য প্রেমের অনন্ত বক্ষ বিস্তার করিয়া বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া প্রেম কে নিবি কে নিবি বলিয়া ডাকিতেছেন! বলিতেছেন,—আয় ভাই! "হরিব'লে অবহেলে নিয়তি এড়াই রে।" বলিতেছেন—ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সর্ব্ব-সার হরি নাম রে! আর বিলম্ব করিও না, হরি বলিয়া ছুটিয়া যাও, প্রেমের সুখময় শান্তিময় আনন্দময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া চিরতাপদগ্ধ প্রাণ শীতল করিবে। অমনি দেখিবে, তোমার মন-প্রাণের অবস্থা, কেমন কল্পনার অতীত ভাবে পৌঁছিয়া গিয়াছে, তোমার খাদ্যাখাদ্য,

আচার, ব্যবহার সবই আজন্ম-সংস্কারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাণ ভরিয়া প্রেমময়ের নাম লইয়া ছুটিতে থাকিলে, দুইদিনেই দেখিবে,—জীবনে কি প্রেমরাজ্যের অপ্রাকৃত হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে! মায়িক ব্যবহারগুলি কেমন আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতেছে! এতদিন তুমি, পরের রক্তে আপনার ধমনী পরিপূর্ণ করিতেছিলে, আর আজ দেখিবে, আপনার রক্তে জগতের তৃপ্তিদানে বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে। দেখিবে,—জন্মজন্মান্তরের বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনে যাহা হয় না, হরি হরি বলিয়া ছুটিতে পারিলে, তাঁহার কৃপায় মুহূর্ত্তেই সে সব পরিবর্ত্তন অনায়াসে হইয়া যায়। এস্থলে এই পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট অধম লেখকের একটি অপূর্ব্ব ঘটনা পাঠক মহাশয়কে বলিতেছি শুনুন—

আমি, পূর্ব্বে একবার কিছুদিনের জন্য মৎস্য ত্যাগ করিয়াছিলাম। তখন মাছ ছাড়িয়াছিলাম, কিন্তু মাছ আমাকে ছাড়ে নাই, লোভটা ভিতরে ভিতরে বেশই ছিল। ক্রমে একটু অসুখও হইল, অমনি আবার মাছ খাওয়া ধরিলাম। এই ভাবে, চলিয়া আসিতেছি, অকস্মাৎ প্রভুর অযাচিত কৃপালাভ করিলাম।* অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার কৃপায় জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম। তখনও আমি মৎস্যভোজীই আছি। অনেক ভক্ত আমাকে মৎস্য ত্যাগের জন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনুরোধে আমার কোন

* যেরূপে প্রভুর কৃপা লাভ হয়, তাহা প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ সূচনাতে আভাস দেওয়া হইয়াছে।

পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আবার মৎস্য খাওয়াটা অন্যায় বলিয়া প্রাণে আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু যখনই অন্যায় বলিয়া মনে হয়, তখনই মনকে প্রবোধ দেই,—শরীরটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, মাছের ঝোলটা বল-কারক পথ্য—না খাইলে শরীর টিকিবে না। দুই চাঁরিদিন এইরূপ বাদানুবাদ চলিল! কিন্তু বাদের চেয়ে অনুবাদেরই জোর বেশী, মাছের ঝোলই বল বিধানে নিযুক্ত থাকিল। অকস্মাৎ একদিন আমি স্বপ্নের হাটে গিয়াছি। হাটে পৌঁছিয়া মৎস্য খরিদ করার উদ্দেশ্যে চলিয়াছি, হঠাৎ একটা হাতী শুঁড় দিয়া এক খণ্ড গোমাংস অনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল—"খা, খুব বলকারক পথ্য।" আমি তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিয়া ঘৃণায় তিন লাফে সরিয়া দাঁড়াইলাম! শ্রীশ্রীপ্রভু তখন কৃপা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন—"জীব-জগতে হাতী ত একটা প্রধান বলবান, কিন্তু কোন্ বলকারক পথ্য বা মাছ মাংস খাইয়া উহার শরীর এরূপ হইয়াছে? ও ত গাছপালাই খায়।" স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! প্রভুর অপার করুণার বিষয় ভাবিয়া প্রাণে কতই আনন্দ পাইতে লাগিলাম। জীবের মধ্যে যে প্রধান বলবান, অথচ যাহার সহিত মাছ মাংসের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার দ্বারা প্রভু এই মৎস্য-লোভীর হাতে গোমাংস দেওয়াইলেন! এবং আমি যাহা মনে করিতাম—হাতীকে দিয়াও ঠিক সেই শব্দটি বলাইলেন—

"খা, খুব বলকারক পথ্য।"

"এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।" প্রভু এক

হাতীর চালেই কিস্তিমাৎ করিলেন! হাতে গোমাংস দিয়া আমিষ খাদ্যে একটা সাংঘাতিক ঘৃণার ভাব আনিয়া দিলেন; আমি, পাপীই হই আর যাই হই, হিন্দুর ছেলেত বটে; এখন, মৎস্যাদি দেখিলেই ঐ গোমাংসের কথা মনে হয়— "খা, খুব বলকারক পথ্য" !! রাম! রাম! ছিছি! আর ওদিকে চায় বা যায় কার সাধ্য। প্রভু হাতীকে দিয়া দেওয়াইয়া আমার মনের বদ্ধ কুসংস্কারটা দূর করিয়া দিলেন। আমার মনে হইত, মাছের ঝোল না খাইলে, শরীর টিকিবে না, প্রভু দেখাইলেন,—জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান হাতীটা ডাল পালা লতা পাতা খাইয়াই জীবন ধারণ করে, অথচ জীবনে মাছ মাংস প্রভৃতি আর কোন বলকারক খাদ্যের সহিত তাহার ত সম্বন্ধই নাই !! তাইত, হাতী ত লতাপাতা খাইয়াই জীব-জগতে প্রধান বলবান !! আমরা দেখিয়াও দেখিনা, বুঝিয়াও বুঝিনা !! পশ্চিম দেশীয় লোকও চিরদিনই নিরামিষভোজী হইয়া কেমন বলবান ও দীর্ঘায়ু !! যে যাহাই খা'ক না কেন, তাহারই সার গ্রহণ করিতে পারিলেই শরীর সবল হয়। কেহ সারাদিন পরে শাক ভাত খাইয়াও হাতীর মত বলবান, আর কেহ দিনে পাঁচবার ঘৃত-মাংস খাইয়াও কাক্‌লাস,— যেন কোনদিন কিছু খান না। এটি বলকারক আর ওটি দুর্ব্বল-কারক খাদ্য এসব মনের সংস্কার মাত্র। এই সময়েই, "রাম মূর্ত্তি" নামাখ্য মহা বীর-পুরুষ, কলিকাতায় আসিয়া, 'মটরকার-ধরিয়া, লোহার-মোটা শিকল ছিঁড়িয়া' সকলকে চমকিত করিয়া সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহার এই অদ্ভুত বীরত্ব সম্বন্ধে

বক্তৃতাতে জানাইলেন,—তিনি নিরামিষভোজী ও স্বল্পাহারী! যাহা হউক, ভ্রম ঘুচিয়া গেল, মাছ্ মাংস না খাইলে শরীর দুর্ব্বল হয়, 'এ' ভ্রান্ত ধারণা দূর হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমিষ খাদ্যে একটা ঘৃণা আসিল, আর ওদিকে যায় কে, আর দুর্ব্বলতা-সবলতার চিন্তাই বা করে কে? জীব-স্বভাবের কথা বলিতে পারি'না— এবার প্রভুর ইচ্ছায় যে খাদ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বোধ হয় ইহার আর কখনও ব্যতিক্রম হইবে না। সেইজন্য বলিতে-ছিলাম—ভাই! প্রেমময় জগদ্বন্ধু হরিকে প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাঁহার কৃপায় সময়-মত সবই হইয়া যাইবে। তুমি ব্রহ্মচারী, ত্যাগী, নিরামিষ-ভোজী হইয়া থাক, সেত অতি উত্তম কথা! তোমরাত প্রভুর প্রিয় কার্য্যই সাধন করিতেছ, আর যাহারা এখনও আমার মত লোভী, কামুক ও মৎস্য-মাংসাশী, তাঁহাদিগকেও প্রভু বাদ দিবেন না, তুমি এখনই খাদ্য পরিবর্ত্তন করিয়া সাত্ত্বিক আহার আরম্ভ করিতে পার, খুব ভাল কথা। আর যদি একবারে ও সব পরিবর্ত্তন করিতে না পার, প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কর— মহাউদ্ধারণ জগদ্বন্ধুনাম কর, দেখিবে—অচিরেই নূতন জীবনে নূতন মাধুরী ফুটিবে, নূতন রাজ্যে নূতন হওয়া ছুটিবে, নূতন আকাশে নূতন চাঁদ উঠিবে। নূতন জগতে জগদ্বন্ধু স্নুন্দর মোহন-বেশে দাঁড়াইয়া তোমাকে নিত্য সুখের অধিকারী করিয়া দিবেন। তুমি নূতন প্রাণে নূতন গানে আপনি মাতিয়া জগৎ মাতাইবে।

শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন—

"মানব জন্ম পাপ করিবার জন্য নহে, কৃষ্ণসেবার জন্য।"

"হরিনাম লও ভাই আর অন্য গতি নাই।"

"আর রক্ষা নাই, সবে হরিনাম লও, সদা হরিকথা কও, নাম সঙ্কীর্ত্তনে রও ;—ঐ প্রলয়।" জীবের পরিত্রানের জন্য, মহাপ্রলয় হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জীব-ত্রাতা জগদ্বন্ধু-হরি সর্ব্বদাই জীবকে হরিনামে ডুবিয়া থাকিতে বলিয়াছেন—কৃষ্ণ-সেবায় জীবন বিকাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মায়ামুগ্ধ জীবের ধারণা—"হরিনাম করিতে হয় শেষ কালে!" চিরজীবন কাম-যাগের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া যখন শরীর শিথিল ও অকর্ম্মন্য হইবে, আর ভোগবিলাসে সামর্থ্য থাকিবেনা, ভগবানের নাম করিতে হইবে তখন। আজকাল আমরা ঐ এক ধুয়া ধরিয়া নিজেও ভগবৎ-প্রসঙ্গে মন দেই না, এবং পুত্রপৌত্রদিগকেও ওপথে যাইতে দেখিলে খড়গহস্ত হই। দেহে প্রাণ থাকিতে আর ওদিকে যায় কে? শেষ সময় দাঁত সিট্কাইয়া চোক উল্টাইয়া মরমর হইলে অমনি তুলসি তলায় লইয়া গিয়া "ওঁ রাম! ওঁ রাম! ওঁ রাম!"—না হয়—"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" দুই চারিবার আওড়াইয়া অমনি দেও সত্বর পাপ মুখে আগুণ জ্বেলে!! তা সারাজীবন যে মুখে হরিনাম হয় নাই; পুত্র-পৌত্রাদি, সে পোড়া মুখ আগুণ দিয়া না পোড়াইয়া আর কোন্ ফুল-চন্দন দিয়া বিভূষিত করিবে!!

ভাই! হরিনামটি যে, একমাত্র ভবপারের সম্বল, তাহা ত দেখি তোমরা ভালরূপই জান! না জানিলে আর শেষ সময় তুলসী তলায় লইয়া গিয়া নাম শুনাইতে যাও কেন? আমরা বলি, এই ভবতারণ শমন-দমন শোক-দুঃখ-তাপ নিবারণ মহা-

নামটি শুধু শেষ সময়ের জন্য ব্যবস্থাটা না করিয়া চিরজীবনের জন্য ব্যবস্থা করিলে হয় না ? মহা-উদ্ধারণের মহাবাক্য স্মরণ করিয়া জীবনটি পাপের স্রোতে ঢালিয়া না দিয়া "কৃষ্ণ সেবায়" নিয়োজিত করিলে হয় না ? অবিরাম, "হরিনাম লও ভাই আর অন্য গতি নাই" স্মরণ করিয়া কার্য্য করিলে হয় না ? ঐ যে আজ জগৎময় মহা প্রলয় ! ভ্রাতৃগণ ! "আর রক্ষা নাই, সবে হরিনাম লও, সদা হরি কথা কও, নাম সঙ্কীর্ত্তনে রও।" মহা উদ্ধারণের মহাবাক্য স্মরণ করিয়া হরিনামে জীবন বিকাও, নিত্যানন্দময় ধামে নিত্যসুখ-শান্তিতে বিভোর হইবে। ভুবন মঙ্গলময় হরিনামটি শ্রীশ্রীপ্রভুর সার্ব্বজনীন উপদেশ। তিনি দৃঢ়তার সহিত সকলকে বলিয়াছেন—

"কর্ম্মকাণ্ড পরিহরি প্রেমে বল হরি হরি।"

আবার আপনাকে পাইবার উপায়টি বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন,—

"আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই।"

সাত্ত্বিক আহার, সদাচার, পবিত্রতা, শুক্ররক্ষা, সত্যনিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি নিত্যশুদ্ধ চিরপবিত্রতাময় সত্যস্বরূপ প্রভুর বড়ই আদরের ধন। তিনি সকলকেই সর্ব্বদা এই সব পবিত্রতার দৃঢ় ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া হরিনামে জীবন বিকাইতে উপদেশ দিয়াছেন। ভ্রাতৃগণ ! তোমরা সকলেই প্রভুবাক্যে জীবন ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কর। তাঁহার আদেশ ও উপদেশ পালনই তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া জানিবে। তাঁহার প্রিয় হইতে হইলে—প্রেমের বুকে আশ্রয় পাইতে

হইলে, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদনেই প্রীতিপাত্র হইতে হইবে। "কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড।" তুমি কর্ম্মী জ্ঞানী হইলেও তোমাকে কর্ম্মকাণ্ড পরিহরি প্রেমে হরি হরি বলিয়া মহাউদ্ধারণের আদেশ অনুসারে তাঁহার প্রেমের ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে—ইহাই প্রভুর আদেশ জানিও। শুধু, মুখে মুখে জগদ্বন্ধুর ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলে হইবে না, তাঁহার হওত, তাঁহার হইতে চাওত, প্রাণপণে তাঁহার মহাবাক্য—আদেশ ও উপদেশ পালন করিতেই হইবে। তিনি বিভিন্ন অধিকারীকে আধার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিলেও হরিনামই সকলের মুখ্যকর্ম্ম, একধর্ম্ম ও একমাত্র আশ্রয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি জীবকে 'কর্ম্ম-কাণ্ড' পরিত্যাগ করিয়া, 'ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম' দূরে নিক্ষেপ করিয়া অবিরত 'সর্ব্বসার হরিনামই' একমাত্র জীবনের সম্বল করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। গৌর, যে জগতুদ্ধারণ হরিনাম নবদ্বীপে আরম্ভ করিয়াগিয়াছেন, এবার হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু, তাহা সমস্ত জগতে বিলাইবেন, হরিনামে রাধাপ্রেমে জগৎ প্লাবিত হইবে, গৌরের মহাউদ্ধারণের অনুষ্ঠান এবার পূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হইবে, এবার ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু ব্রহ্মাণ্ডময় কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবেন। অচিরে সর্ব্ব অবতারের ভবিষ্যদ্বাণী, সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রাণের অভ্রান্ত অনুভূতি, ভক্তগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টফল ঘোষণা কার্য্যে পরিণত হইবে—ভূলোক গোলোক হইবে!! জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় মহা-উদ্ধারণ লীলা!

অবতার ও অবতারী।

সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের জগৎময় এই ভগবৎ-আবির্ভাবের ঘোষণা ও অনুভূতি উপেক্ষা করিয়াও হয়ত অবিশ্বাসীগণ বলিবে,—বর্ত্তমান মহাবতারী পূর্ণ ভগবান যে জগদ্বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইবেন, তাহা আমরা শাস্ত্রগ্রন্থে ত কিছু দেখিতে পাই না?" এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে চাই,—যুগে যুগেই যুগাবতারকে পুরাণাদিশাস্ত্র, জানিতে ও প্রকাশ করিতে পারেন, তাই দশাবতারের খবর দিয়াছেন, কিন্তু মহাবতারী সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিছু বলিতে পারেন নাই, এখনও পারিবেন না। শাস্ত্র, পূর্ব্বেও অবতারী শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই, যুগাবতার বলরামকে জানিয়া জগতে ঘোষণা করিয়াছিলেন; মহাবতারী শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এবং সম্মিলিত রাধাকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ-লীলা সম্বন্ধে কখনও বিশেষ কিছু জানিতে বা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রের অতীত তত্ত্ব শাস্ত্র জানে না। সেইজন্য এবারও একাধারে পূর্ণ-মিলনে হরিপুরুষ জগদ্বন্ধুরূপে ভগবানের মহাবতারণটি ও মহা-উদ্ধারণ তত্ত্বটি শাস্ত্রের অজ্ঞাত। মহাবতারী শ্রীকৃষ্ণত আপনিই আপন আবির্ভাব বা অবতারণ তত্ত্বটি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

শ্রীকৃষ্ণের নিজের মুখেই প্রকাশ তাঁহার আবির্ভাবের কোন কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান

হইবে, তখনই তিনি, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় অবতীর্ণ হইবেন। আবশ্যক হইলে একই যুগের ভিতর তিনি বহুবার অবতীর্ণ হইতে পারেন। ভগবানের আবির্ভাব, তাঁহার নিজের ইচ্ছাধীন, যখন আবশ্যক বোধ করেন তখনই আসেন, তা আবার শাস্ত্র প্রমাণের অপেক্ষা কি? শাস্ত্রে যেটুকু উল্লিখিত আছে, তিনি শুধু তাহাই. তিনি শুধু তাহাই করেন, বা পারেন, আর কিছু করেন না, বা পারেন না, এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, প্রিয়ভক্ত নবদ্বীপ দাস মহাশয়কে বলিয়াছেন—"ভগবানের আবির্ভাব শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জানিবি কি? তাঁহার নিজের ইচ্ছা। লক্ষণে চিন্‌বি, শক্তি প্রকাশ করিলে ও জগৎকে জানাইলে জগৎ জানিতে পারে। যুগাবতারের ভগবানে বা দশাবতারে প্রায়ই শুধু ঐশ্বর্য্য বিভাগের ভগবানও ভগবতীর লীলাখেলামাত্র। যেমন, রাম বৈকুণ্ঠের নারায়ণ, বলরাম অনন্ত ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ যে দশাবতারের অন্তর্গত নহেন, তাহা সকলেই জানেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, অবতারী,—পূর্ণভগবান গোলোকের শ্রীহরি। শ্রীগৌরাঙ্গও পূর্ণাবতারী, এবং বর্ত্তমান শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরও মহাবতারী, সেইজন্য কৃষ্ণ, গৌর ও জগদ্বন্ধুসুন্দর সম্বন্ধীয় আবির্ভাব তত্ত্ব বেদপুরাণের অতীত। শাস্ত্র ইহার খবর জানে না। ভ্রাতৃগণ উঠ, জাগ, এস, এবার মহাবতারী পূর্ণ ভগবান শ্রীহরি এই যে সমস্ত জগতে শান্তিময় প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত করিতে—হরিনামে রাধাপ্রেমে বিশ্বপ্লাবিত করিতে

জগদ্বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহা-উদ্ধারণের কার্য্য অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে, মহা-উদ্ধারণকে বরণ করিয়া লইতে সমস্ত জগতে সাজ সাজ রোল উঠিয়াছে! আর ঘুমাইও না, আর মোহের অন্ধকারে অন্ধবিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতার কোঠরে পেচকের মত চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিও না। তাঁহার মহাপ্রকাশ অদূরে। শীঘ্রই সমস্ত জগৎবাসী তাঁহার মহাপ্রকাশে মহা প্রেমলীলায় প্রেমেমাখা হরিনাম গানে—প্রেমপীযূষভরা প্রাণে নিত্য সুখ-শাস্তিতে বিভোর হইয়া যাইবে। এবার সর্ব্বশক্তি সম্মিলিত পূর্ণ লীলারসময় জগদুদ্ধারণ মহামন্ত্র,—হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধু নাম। সম্মিলিত সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র ও পুণ্যতীর্থ—'ফরিদপুর—গোয়ালচামট ধাম।' শীঘ্রই শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাপ্রকাশে সকলের চক্ষুকর্ণের বিবাদ মীমাংসা হইবে। ঐ যে তিনি জগৎময় আত্ম-শক্তি সঞ্চারে মহালীলার মহাভাব ও মহাগীতি জাগাইয়া সময়ের প্রতীক্ষায় নীরবে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতেছেন। পরম তত্ত্বদর্শী শ্রীমতী আনি বেসান্ত্ বলিয়াছেন—

"We who know something of the occult life, we who of our own knowledge bear witness that He lives upon our earth, are waiting for His coming: and already the steeps of the Himalayas are echoing to the footsteps that tread them to descend into the world of men. There He is standing, awaiting the striking of His hour; there He is standing, with His eyes of

love gazing on the world that rejected Him aforetime, and perchance will again reject Him; there he is waiting till the fulness of the time is ripe, till his Messengers have proclaimed His advent, and to some extent have prepared the nations for His coming."

জয় হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ !
জয় হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ !!
জয় হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ !!!
প্রেম ! আনন্দ !! শান্তি !!!

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

প্রেম-যোগ।

পরিশিষ্ট।

আমার কথা।

ভগবানের অপূর্ব্ব বিধান। ফুলের হাসিতে চাঁদের রশ্মিতে জগৎ আলোকিত হয়, আবার বিষধর সর্পের বিষেও মুমূর্ষু রোগীর বদনে হাসি-রাশি ভাসিয়া উঠে। সাধু-সজ্জনের সদ্দৃষ্টান্তে মানুষের কর্ত্তব্যপথ সূচিত হয়, আবার চোর-দস্যুর পাপের পরিণামও মানুষকে সতর্ক করিয়া কর্ত্তব্যপথে চালিত করে। তাই আজ এই অধমের দুটি কথা পাঠক মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর পূর্ণভগবত্তা ও মহাউদ্ধারণ লীলার কতকটা পরিচয় দিতে বাসনা করিয়াছি। আমি নগণ্য ক্ষুদ্র কীটাণুকীট হইলেও শ্রীশ্রীপ্রভুঁর অযাচিত কৃপায় যে—

"খোঁড়ায় নাচে, বোবায় গায়,
অন্ধে দেখে চো'ক মেলে।"

তাহাই আজ জগতকে দেখাইব, তাহাই আজ আমার মত মায়ামুগ্ধ জীবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া মাভৈ মাভৈ রবে

আশ্বাস প্রদান করিব। সকলকেই প্রাণ ভরিয়া বলিব—ভাই! আর ভয় নাই, এই দেখ শ্রীহরি, জগদ্বন্ধুরূপে জগতের উদ্ধারণে আসিয়াছেন,—আমাদের মত অধম পতিতকে এই দেখ কেমন ব্যাকুল হইয়া আপনার প্রেমের কোলে তুলিয়া লইতেছেন!

আমি শৈশব হইতেই ভগবদ্ভক্তিবিহীন;—নামে রুচি নাই, দেব দ্বিজে ভক্তি নাই, ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, ভগবৎ-লীলা ও অবতারে বিশ্বাস নাই। বদ্ধপাপীর যেরূপ অবস্থা, কামিনী-কাঞ্চনে যেরূপ আসক্তি,—পাপে-তাপে মজিয়া থাকাই যেমন জীব-স্বভাব, সেইরূপে সংসারস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যাবতীয় পাপ-তাপের মোহ-মদিরায় মুগ্ধ হইয়া স্রোতের তৃণের মত নরকপানে ছুটিয়াছিলাম। বিষ্ঠার কৃমির মত সদানন্দে বিষ্ঠা-কুণ্ডে—কামিনী-কাঞ্চনের মোহময় বিষ্ঠার ভাণ্ডে আনন্দে সাঁতার কাটিতে কাটিতে—ঘুর্ণিপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে অকস্মাৎ ঢাকা জিলা ছাড়িয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া,

"আমি কবিরত্ন কবিরাজ"

বলিয়া বড় বড় অক্ষরে সাইন বোর্ড দিয়া, ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিতে বসিলাম। পসার একরূপ জমিয়া গেল। ক্রমে চিকিৎসা প্রসঙ্গে নানা প্রকার লোকের সহিত মিশিতে লাগিলাম। কাহার শুভ ইচ্ছায়, কাহার অযাচিত কৃপায় জানি না—নিকটবর্ত্তী শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ অবধূত ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তবৃন্দের সহিত ক্রমে একটু একটু মিশিতে লাগিলাম। তাঁহারা কীর্ত্তন করেন; সময়ে তাঁহাদের সহিত মিশি—'রোগী যেন নিম খায়

মুদিয়া নয়ন।' কখন কখনও একটু নামেও যোগ দেই। ক্রমে ক্রমে ভক্তদিগের মুখে তাঁহাদের গুরুদেবের (অবধুত ঠাকুরের) অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কথা, শক্তির কথা, ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে খুব ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঠাকুরের একখানা ফটো সংগ্রহ করিলাম, ভক্তগণের সঙ্গে মিশিয়া কয়েকবার মনোহরপুকুর আশ্রমেও গেলাম। এবার মনে বাসনা জাগিল,—"এইরূপ কোন মহাপুরুষের নিকট দীক্ষিত হইতে না পারিলে আর বাস্তবিক শান্তি নাই!" আহা! ইহাঁরা কেমন ভাগ্যবান্! ইহাঁদের কেমন সুন্দর অবস্থা! যাঁহারা এইরূপ মুক্ত মহাপুরুষকে জীবন-তরণীর কাণ্ডারী করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কেমন সৌভাগ্যশালী!! আহা মরি মরি! ইহাঁদের জীবন কি অপূর্ব্ব শান্তিময়!! আমার ভাগ্যে কি এমনটি ঘটিবে!!

এখানে বলা আবশ্যক—ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নাই! দীক্ষাটা কেবল কুলগুরু-দিগের ব্যবসার ফন্দী বলিয়াই মনে করিয়াছি। আমাদের কুল-গুরু কলিকাতা নিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীশ্রীশ্যামলাল সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের নাম অনেকেই জানেন। কুলগুরুর মধ্যে এমন সিদ্ধমহাপুরুষ, এমন সুপণ্ডিত অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু আমি ওরসে বঞ্চিত রহিলাম। দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা আমার কখনও বোধ হয় নাই। এখন শ্রীশ্রীঅবধুত ঠাকুরের ভক্তবৃন্দের সুন্দর অবস্থা দেখিয়া,—তাঁহাদের প্রতি গুরুদেবের অসাধারণ কৃপার কথা শুনিয়া, ঐরূপ মুক্ত মহাপুরুষের নিকট

দীক্ষা গ্রহণ করিতে একটু রুচি জন্মিল। কিন্তু অবধুত ঠাকুর ত ইতিপূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। এখন কোথায় যাই! কোথায় গেলে এমনটি পাই!! দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল,; অকস্মাৎ একজন ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত নামক একখানা গ্রন্থ পাইয়া পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আহা! রামকৃষ্ণের মত গুরু যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা কত ভাগ্যবান্—মনে করিয়া নিজকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

কথামৃতের একস্থানে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন,—"আমি যেমন তোমার সহিত কথা বলিতেছি, ভগবান্ এইরূপে সম্মুখে আসিয়া কথা বলেন, দেখা দেন।" পড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম! 'ভগবান আসিয়া দেখা দেন! সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলেন!!' কি আশ্চার্য্য!! একি সম্ভব? কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের এ কথাত অবিশ্বাস করা যায় না! তিনি যখন বলিয়াছেন, তখন এ কথাত মিথ্যা হইবার নহে!! তবে কি ভগবান্ সত্যসত্যই জীবকে দেখা দেন, সত্যসত্যই

"ভগবান আসিয়া জীবের সহিত কথা বলেন!!"

মানব জীবনে একথা কি বাস্তবিক সম্ভব; রামকৃষ্ণদেব যখন বলিয়াছেন, তখন বাস্তবিক সম্ভব। বাস্তবিকই সত্য ঘটনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহ নাই বটে,—রামকৃষ্ণের পক্ষে, ও তাঁহার ভক্তগণের পক্ষে। রামকৃষ্ণের মত গুরুদেবের

নিকট যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ওরূপ ভগবৎ দর্শন সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু কুলগুরুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণে এরূপ ভগবৎ-দর্শন কখনও সম্ভবে কি? এই যে ত্রিশকোটি হিন্দুসন্তান, ইঁহারা সকলেইত কুলগুরুর মন্ত্র-দীক্ষায় জীবনযাপন করিতেছেন, কিন্তু কৈ? ইহাঁদের ক'জনের এরূপ ভগবদ্দর্শন ঘটিতেছে? ক'জনের মনপ্রাণের অবস্থা মায়াতীত অপ্রাকৃত ভাবে গঠিত হইয়াছে? প্রত্যেকেই ত দুই চারবার 'কর' না ঘুরাইয়া অন্নপ্রাসন করেন না। সকলেইত কুলগুরুর অধীন, তবে কৈ ভগবান কৈ? ক'জনের সম্মুখে তিনি আসিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াছেন? ক'জন গুরু, শিষ্যকে ভগবদ্দর্শন করাইয়াছেন? পরের উদ্ধার ত পরের কথা, ক'জন গুরু আপনার উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন, বলিতে পারেন কি? গুরুতা টা ব্যবসা নহে,—জীব-উদ্ধার—জীবের ব্যবসাস্থানীয় হওয়াটা বড়ই দুঃখের বিষয়। আজকাল অনেকে নির্ল্লজ্জের মত কাগজে কলমে লিখেন,—ব্যবসা গুরুতা!! হায়! পরের মাথায় পা দিয়া উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে একবার নিজের উদ্ধারের চিন্তাটা করিলে হয় না? দূর হ'ক ছাই, আজকাল যেমন চৈতা গুরু, তেমন মৈতা শিষ্য। ওরূপ দীক্ষাতে আমার মত পাপীর জীবনে যখন কোন পরিবর্ত্তনই দেখিতে পাই না, তখন আমি নিশ্চয়ই কাহারও সহিত ব্যবসা পাতাইয়া শিষ্য সাজিতে পারিব না। হায়! তবে কোথায় যাই! কোথায় গিয়া তেমনটি পাই, কোথায় সেই গুরু?

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

কোথায় যাই, কোথায় গিয়া তাঁহাকে পাই, কে আমাকে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করাইয়া ধন্য করিয়া দিবেন!? এ সময়ের শ্রীশ্রীঅবধুত ঠাকুরের ভক্তবৃন্দের কৃপা ও ভালবাসার কথা জীবনে বিস্মৃত হইব না। তাঁহারা অনেকে আমার জন্য ঠাকুরের কাছে সজল নয়নে করুণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃপ্রতিম সরোজ, গোপাল অধিকারী, কালীপদানন্দ অবধুত, শ্যামসুন্দরানন্দ অবধুত, নিত্যানন্দ অবধুত, মহেশ্বরানন্দ অবধুত, কেশবানন্দ অবধুত প্রভৃতি মহাত্মগণ আমাকে যেরূপ স্নেহ করিয়াছেন, আমার জীবনের উন্নতির জন্য যেরূপ কায়মনো-বাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, সে ভালবাসা পূর্ণ অকৃত্রিম ভাব জীবনে বিস্মৃত হইব না। তজ্জন্য আমি চিরঋণী। প্রার্থনা করি, শ্রীশ্রীপ্রভু অযাচিত করুণায় তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করুন।

এই সময়ে কোন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধ অবস্থা জানিয়াও, তাঁহাদের কেহ কেহ প্রাণের গূঢ় কথা,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের কথা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, জানিয়াও কেন যেন প্রাণের আগ্রহ হইল না। কি যেন চাই, কোথায় গেলে যেন পাইব, ইহাঁদের দয়া থাকিলেও এখানে যেন সে জিনিসটি মিলিবে না বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি বলিয়া ফেলিলাম, "আপনার দয়া যথেষ্ট আছে, কিন্তু আমার প্রাণের আগ্রহ নাই, ক্ষমা করিবেন। আমার যদি কেহ থাকেন, তবে আমার কাছে সেইরূপে—সেই ইষ্ট মূর্ত্তিতে আসিয়া

দাঁড়াইবেন, নতুবা আমি যেখানে সেখানে মাথা বিকাইব না। দীক্ষামন্ত্র লইয়া কি করিব? মন্ত্র জপিয়া ভগবৎ-লাভ করিব,—আমার এত সাধন ভজনের ক্ষমতা নাই।" হায়! রামকৃষ্ণ-দেব বলিয়াছেন, "ভগবান্ সম্মুখে আসিয়া দেখা দেন,—কথা বলেন।" এ ত বাস্তবিক সত্য কথা। রামকৃষ্ণের এ কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তাই যদি হয়, এই নশ্বর-মানব দেহেই যদি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব হয়, তবে সেটি না হইলে এ জীবনে শান্তি কি?. ফল কি? এ নশ্বর মলমূত্রের আধার দেহটা বহন করিয়া আবশ্যক কি? সেটি যদি না হইল, তবে বৃথা, শিয়াল কুকুরের মত আহার নিদ্রা মৈথুনে জীবন ক্ষয় করিয়া প্রয়োজন কি? এই কি মানবজীবনের পরিণতি!! এই জন্যই কি মানুষ জন্মগ্রহণ করে!! হা ভগবান্! হা শ্রীহরি! কোথায় তুমি? আমি কি তোমার দেখা পাইব না? আমি পাপী বলিয়া কি তুমি দেখা দিবে না? তুমি রামকৃষ্ণ-দেবকে দেখা দিয়াছ, আমার সেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই বলিয়া কি এই অধমের প্রতি কৃপা করিবে না? হা নাথ! পিতামাতা কি অজ্ঞ বালককে ধূলি ঝাড়িয়া কোলে তুলিয়া লয় না? আমি অধম কীটাণুকীট—মহাপাপী, তাই বলিয়া কি তুমি কৃপা করিয়া চরণে স্থান দিবে না? তোমার অজ্ঞ শিশুকে ধূলি ঝাড়িয়া সোহাগের শান্তিময় কোলে তুলিয়া লইবে না? হা ভগবন্! কোথায় ভগবান্? একবার নিজগুণে দয়া ক'রে এস! দেখা দাও—বাসনা পূর্ণ কর।

একদিন, ভ্রাতৃপ্রতিম কালীপদানন্দ অবধূত ও শ্যাম-

সুন্দরানন্দ অবধুতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বল দেখি ভাই! কোথায় গিয়া কার কাছে দীক্ষিত হই?—কোথায় তেমনটি পাই? আর কতদিন এ ভাবে কাটাইব? দিন যে ফুরায়ে গেল!! ইঁহারা উভয়ে বলিলেন,—"তুমি, 'ভাই ভূপতি' নামক মহাপুরুষের নিকট—অথবা দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত 'গম্ভীরানাথ বাবার' নিকট যাও। ইঁহাদের নিকট দীক্ষিত হইলে বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। 'এ দুটি মহাপুরুষ কে' আমরা বিশেষরূপ জানি, ইঁহাদের ভক্তগণের অবস্থাও বড় সুন্দর।"

কিছুদিন পরে বিষয় কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া 'ভাই ভূপতি' নামক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ইঁহাকে আমি পূর্ব্বেও মনোহরপুকুর আশ্রমে দেখিয়াছি। ইনি আবেশে প্রায়ই ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ দর্শনে নানারূপ কথোপকথন করিয়া থাকেন। আজ ইঁহার দর্শনে বড়ই আনন্দিত হইয়া দীক্ষাগ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলাম। ইনি আমার প্রতি আপনার জনের মত কত আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের সেই বালকের মত সরল সুন্দর মধুর ভাবটি জীবনে কখনও ভুলিব না। তিনি আমাকে কি করিবেন, কোথায় রাখিবেন যেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। এত আদর যত্ন করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন—"তোমার দীক্ষার দরকার নাই। তিনি (ভগবান্) তোমাকে ধ'রেছেন, কোন চিন্তা নাই। তিনি এখন যে অবস্থায় রাখিয়াছেন সেই অবস্থায় থাক, কিছুদিন পরে আবার যে অবস্থায় রাখিবেন, সেই অবস্থায় থাকিবে।"

আমি, মহাপুরুষের এ বাক্যের কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। আমি পাপ-তাপক্লিষ্ট বদ্ধজীব,—আমাকে ভগবান্ ধ'রেছেন! কৈ? আমিত কিছুই বুঝি না, বা জানি না, আমিত ক্ষুদ্র তৃণের মত ভবস্রোতে লক্ষ্যহীন পথে ভাসিয়া বেড়াইতেছি!! কোথায় বা ভগবান্, আর কোথায় বা তাঁহার কৃপা!! আর কোথায় বা আমি!! যাহ'ক এবার ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু মনে হইল,—আর একবার আসিয়া বিশেষ-রূপে ধরিব। না হয় অনুরোধ করিয়া রাজবাড়ী বাসায় লইয়া গিয়া ইঁহার নিকট হইতেই আমাকে দীক্ষা-গ্রহণ করিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে রাজবাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় ভগবানের দিকে চাহিয়া এক এক করিয়া দিন গণিতে লাগিলাম। হা ভগবন্! তুমি রামকৃষ্ণদেবকে দেখা দিয়াছ, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কথা বলিয়াছ! মানুষের প্রতি তোমার এত কৃপা!! কিন্তু হায়! আমার মত অধম কি তোমার কৃপা পাইবে না? যাঁহাদিগকে তুমি দেখা দেও, তাঁহারা তোমার ভক্ত, আর আমি না হয় অভক্ত। অভক্ত পাপী·তাপী কি তোমার কৃপায় বঞ্চিত থাকিবে? আমি ভক্তিহীন,—তুমিত অনন্ত প্রেমময়—অনন্ত দয়াময়! নিজগুণে কি দয়া করিবে না?

অকস্মাৎ একটি শুভ রজনীর সমাগম হইল। কত কি ভাবিতে ভাবিতে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, অকস্মাৎ একি দৃশ্য! একি স্বপ্ন! স্বপ্ন হইলে, এমন স্বপ্ন যেন মানুষের কখনও ভাঙ্গে না! এ প্রাণারাম মূর্ত্তি যেন কখনও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় না!! এই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, এই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিখানি বুকে করিয়া

যেন মানুষ আমার এই সুখস্বপ্নের মত অনন্তকাল নিরবচ্ছিন্ন আলিঙ্গনে বিভোর হইয়া ঘুমাইয়া থাকে। একি স্বপ্ন! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! একি স্বপ্ন! তুমি কি আজ স্বপ্নে আসিয়া এই হতভাগ্যকে এমনি করিয়া ধন্য করিলে? না কি তুমি সত্য সত্যই 'রামকৃষ্ণ দেবকে ধন্য করার মত এই অকিঞ্চনকে বুকে তুলিয়া লইয়া কত কি করিলে, কত কি বলিলে!! আহা! এ যদি স্বপ্ন হয়, এ স্বপ্ন যেন ভাঙ্গে না! এ যদি স্বপ্ন হয় এই স্বপ্নের ছবি বুকে করিয়াই যেন এমনি করিয়া অনন্তকাল ঘুমাইয়া থাকি!! তোমরা আর কেহ নশ্বর সংসারের কোলাহল শুনাইতে,—তোমরা আর কেহ নশ্বর জগতের মায়ার দৃশ্য দেখাইতে আমাকে এ সুখস্বপ্ন হইতে জাগাইও না। জীবনে কখনও আর এমন রূপ দেখি নাই, এমন কথা শুনি নাই, এমন ধন বুকে করিয়া এমনি করিয়া সুখের তরঙ্গে ভাসি নাই! কতক্ষণ এ অভিনয় চলিল ঠিক জানি না, আবার আসিব, আবার দেখা হবে বলিয়া কৃষ্ণধন, আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইলেন, আমি এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে আপন মনে গাহিতেছি,—

"দেখিয়ে তোমারে, দেখা দিয়ে যাব ফিরে।"

অকস্মাৎ একজন আসিয়া বলিল, শীঘ্র বাসায় আসুন, এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ আসিয়াছেন, এমন রূপ আর কখনও দেখি নাই। তিনি সেবা করিতে বসিয়া ত্রিশটি তুলসী চাহিতেছেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল!! আহা! একি স্বপ্ন? এ কি দৃশ্য? কৈ কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ!! জীবনে এমন ঘটনাত আর ঘটে নাই, এমন রূপত আর দেখি নাই! এ কি

স্বপ্ন !! না, বাস্তবিক ঘটনা ? আহা এ যদি স্বপ্ন হয় তবে আবার ভাঙ্গিয়া যায় কেন ? এ যদি স্বপ্ন হয়, তবে এমন করিয়া জীবনকে প্রকৃত শান্তিময় ও আনন্দময় করিয়া তুলে কেন ? এ যদি স্বপ্ন হয়, তবে ইহাতে সত্য সত্যই জীবনে অপ্রাকৃত অবস্থা আনিয়া দেয় কেন ? এ স্বপ্ন কি মিথ্যা ? এ কি অমূলক চিন্তা ? না না ইহা কখনও অমূলক চিন্তা-প্রসূত হইতে পারে না। কেন না—জীবনে এমন চিন্তা ত কখনও করি নাই !! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন,—"ভগবৎ-স্বপ্ন মিথ্যা নহে। শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ অবধুত ঠাকুরও ঠিক এই কথাই লিখিয়াছেন—"ভগবৎ-স্বপ্ন বাস্তবিক সত্য ঘটনা !" তবে কি উহা বাস্তব ঘটনা ? সত্য সত্যই কি কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া দেখা দিয়া ঐ যে কি বলিয়া গেলেন—আবার দেখা হবে !!

আহা ! কৈ সে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ, কৈ সে মধুর বীণাবিনিন্দিত ভাষা ! 'আবার আসিব' বলিয়া কোথায় লুকাইলে !! কোথায় নাথ ! তুমি জীব-উদ্ধারে আসিয়াছ, জানাইয়া গেলে। হা নাথ ! কোথায় আছ ? কোন্ মহাপুরুষের মূর্ত্তিতে আসিয়াছ। কি নামে কোথায় অবস্থান করিতেছ !!—তাহাত কিছু বলিলে না ? কোথায় যাই ? কোথায় গিয়া তোমায় পাই ? কেবল জানাইলে —"মহাপুরুষ বেশে আছ,"—আর জানাইলে—"প্রত্যহ একটি করিয়া তুলসী দিতে।" বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বে আমি খাদ্য-জিনিস নিবেদন করিয়া খাইলেও কখনও তুলসী দিয়া নিবেদন করিতাম না।

কিছুদিন যাইতে না যাইতে কৃপা করিয়া জানাইলে—

বুঝাইলে, "এবার জীব-উদ্ধারের জন্য জগদ্বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইয়া গোয়াল চামট শ্রীঅঙ্গনে নীরবে অবস্থান করিতেছ।" এবার স্বপ্নে যাহা দেখাইলে, যে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়রূপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, অযাচিত করুণায় মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া জীবন ধন্য করিয়া দিলে, তাহা ভাষার অতীত, লেখনীর অজ্ঞাত। আহা মরি মরি! আজ এই অপূর্ব্ব দর্শনে একি অযাচিত কৃপাতরঙ্গ আসিয়া এ অধমকে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভাবসাগরের অতল তলে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া গেল। পাদ-পদ্ম বক্ষে ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই জলপ্লাবনের মত কি যেন একটা অমৃতময় স্রোত আসিয়া প্লাবিত করিল,—সে স্রোতে কত কি ভাসিয়া আসিল, কত কি দেখিলাম, কত কি পাইলাম, কত কি ধরিলাম!! চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অমনি আবার সে অমৃত-রাশি জগত ভরিয়া ছড়াইতে আরম্ভ করিলাম।—প্রেম-যোগ লেখা আরম্ভ হইল।

আজ শ্রীশ্রীপ্রভুর অযাচিত করুণায় ব্রজলীলা ও গৌরলীলা সাক্ষাৎ দর্শনের মত অপূর্ব্ব ভাব, রাগ, রস ও প্রেমতত্ত্ব লইয়া সম্মুখে নাটকের ছিনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! হা প্রভো! একি দৃশ্য! এই ব্রজলীলা ও গৌরলীলার এমন অপূর্ব্ব-তত্ত্ব ত আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই,—কখনও জানি না। এসব লীলা সম্বন্ধীয় কোন শাস্ত্রগ্রন্থও ত জীবনে কখন পড়ি নাই!! হায়! যে ব্রজলীলাকে চিরদিনই আমি ব্যভিচার-দুষ্ট কেলেঙ্কারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছি! "একদিন পাংসা স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

শিয়রে যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলাম ঃ—"তোমরা যেমন বদমায়েস,মাথার কাছে চিত্রপটও রাখ তেমনি !" সেই রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা, এমন অপ্রাকৃতভাবমাধুর্য্য বিকাশ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ! আহা মরি মরি ! একি জীবন্ত স্বপ্ন ! এ কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব! একি অপূর্ব্ব প্রেম-মাধুরী ! মরি মরি ! ব্রজলীলা !—এত সুন্দর, এমন অপ্রাকৃত প্রেমামৃতের রসে গড়ান ! এমন ভাবরাজ্যের সোহাগ-মাধুর্য্য দিয়া জড়ান !! আহা মরি মরি ! বলিহারি বলিহারি—প্রভো তোমার মহাউদ্ধারণ পাতকী-তারণ লীলার মহিমা কে বুঝিবে ? এবার জগতের পাপী তাপীকে এমনি করিয়াই বুঝি তোমার প্রেমামৃতের কণিকা পান করাইয়া ধন্য করিবে !! জয় জগদ্বন্ধু হরি ! জয় তোমার মহাউদ্ধারণ লীলা !!

শ্রীশ্রীপ্রভু আজ দয়া করিয়া আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলার মাধুর্য্য দেখাইয়া বর্ত্তমান লীলার তত্ত্বটি বুঝাইয়া মুহূর্ত্তে কোন্ অপার্থিব রাজ্যে যেন লইয়া গেলেন, বর্ত্তমান প্রেমামৃতের প্লাবনে ডুবিয়া অতীতের ব্যবহারে—অতীতের কৃষ্ণনিন্দার স্মরণে প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। আহা! আমি এমন প্রেমলীলাকে প্রেমের মাধুর্য্যকে কাম-কলুষিত হৃদয়ে এমন করিয়া নিন্দা করিয়াছি !! ছি ছি ! আমার নরকেও স্থান নাই।

আজ প্রভু যাহা জানাইলেন, তাঁহার আবেশে সেই অজ্ঞাত অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রেমলীলার অপূর্ব্ব ভাবরাশি প্রেম-যোগ নামে প্রকাশ করিয়া—কৃষ্ণ নিন্দার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এই মহা অপরাধী আজ ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া

জগৎবাসীর দ্বারস্থ হইয়াছে, আপনারা সকলেই পদরজ দানে অধমকে কৃতার্থ করুন।

পাঠক মহাশয়! আমার এই ক্ষুদ্র-জীবন নগণ্য হইলেও শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাউদ্ধারণলীলার জ্ঞাপক বলিয়া—ইহাতে তাঁহার কৃপাকণিকা সিঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া; ক্ষুদ্র হইলেও আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। প্রত্যেক অবতারে পাপীর জীবনই ভগবানের উদ্ধারণ-লীলার সাক্ষী স্বরূপ। জগাই মাধাই-ই গৌরলীলার গৌরব স্থল। সেইরূপ আমি মহাপাপী হইলেও—শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অযাচিত করুণায় এ পতিত জীবনটি আমার মত পাপী তাপীর যে আশা-ভরসা-স্থল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? যিনি আমার মত অবিশ্বাসী নারকীকে কৃপা-কটাক্ষে ধন্য করিয়াছেন, সেই হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু সুন্দর যে জগৎবাসী সমস্ত নরনারীকেই মুহূর্ত্তে স্বরূপ আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। জীব-উদ্ধারে জীবত্রাতা শ্রীহরিরই একমাত্র অধিকার। তিনি ভিন্ন আর কেহ জীবোদ্ধার করিতে পারেন না। আমার মত একটিকে যিনি কৃপা কটাক্ষে ধন্য করিয়াছেন, জগতের অনন্ত কোটী জীবকে যে তিনি এইরূপে প্রেমের বুকে তুলিয়া লইবেন—তাহা নিশ্চয় অভ্রান্ত সত্য—কোন সন্দেহ নাই।

পাঠক মহাশয় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন,—আমি ইতি-পূর্ব্বে কখনও শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর নিকট যাই নাই। মনে করিতাম,—যাঁহাকে দেখা যায় না, যিনি কথা বলেন না, তাঁহার নিকটে যাইয়া দরকার কি? সেখানে যাওয়াও যে কথা,

নিরাকার ভগবানের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হওয়াও সেই কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শ্রীশ্রীপ্রভু কিরূপে কি কৌশলে মুহূর্ত্তে আমাকে নরক-নিলয় হইতে কেশে ধরিয়া তুলিলেন! একেবারে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া অযাচিত করুণায় চক্ষুর পলকে কোথায় লইয়া গেলেন—কত অপূর্ব্ব অজ্ঞাত তত্ত্ব জানাইলেন—আত্মশক্তিসঞ্চারে জগতে প্রেম-যোগ প্রকাশ করাইলেন!! আমার মত শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত অধম হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুর এই প্রেম-যোগ প্রকাশ তাঁহারই মহাউদ্ধারণলীলার একটী জ্বলন্ত নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাঠক মহাশয় সহজেই অনুভব করিবেন, —এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা—মহাবতারী শ্রীভগবানের অযাচিত করুণা ভিন্ন, কোন সাধু সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষের দ্বারা কখনও সংঘটিত হইতে পারে না। সাধু সন্ন্যাসী কি জীবের সম্মুখে কৃষ্ণমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া দেখা দিতে পারেন? সাধু সন্ন্যাসীগণ কি আমার মত শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য এই পতিত জীবের ভিতর দিয়া জগতে নূতন ভাব ও নূতন রসমাধুরীময় প্রেম-যোগ প্রকটন করিতে পারেন? শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু যে পূর্ণ ভগবান্ মহাবতারী শ্রীহরি, আমার এই পতিত জীবনে কৃপা-কটাক্ষপাতই তাঁহার একমাত্র সাক্ষী। কেননা এরূপ ব্যাপার অন্ধের দৃষ্টিশক্তি, ও পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন হইতেও যে আশ্চর্য্যজনক তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমার সন্দেহ ভঞ্জন।

(দৈববাণী।)

শ্রীশ্রীপ্রভুর অযাচিত করুণায় আজ প্রাণে নূতন হাওয়া বহিয়াছেঁ, জীবনের বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নূতন আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, কি যেন কেমন মধুর-ভাবে, কি যেন কেমন সুখ-স্বপ্নে দিন রাত কাটিয়া যাইতেছে !! আহা ! সেই রূপ, সেই কথা, সেই প্রীতিভরা আনন্দময় স্বপনের ছবি ! এই ব্রজলীলা ও গৌরলীলার অনাস্বাদিত তত্ত্ব-সুধা ! আহা ! ধন্য মানব জীবন ! এই নশ্বর জীবনেও যদি এমন করিয়া শ্রীভগবানের অবিনশ্বর লীলামাধুরী সম্ভোগ হয়, আহা মরি মরি ! শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, স্পর্শন, সেবন। এই দেহে—এই জড়দেহে কি সম্ভব ?—না না মিথ্যাকথা ! তাহা কি সম্ভব ! নিশ্চয় সম্ভব ! প্রেমময়ের অযাচিত প্রেমের রাজ্যে অহেতুক কৃপার রাজ্যে সবই সম্ভব ! এই জড়দেহে তাঁহার কৃপায় সবই সম্ভব—সবই প্রকৃত সত্য !! আমার মত জীবের সাধন ভজনে সম্ভব নয়, তাঁহার অনন্ত দয়া ও অহেতুক কৃপায় সবই সম্ভব,—অসম্ভব কিছুই নাই। আজ বুঝিল্যাম,—রামকৃষ্ণদেবের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। নতুবা কখনও যাহা মনে করি নাই, সম্ভব বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি নাই, তাঁহার কৃপায় আজ তাহাই প্রত্যক্ষীভূত হইল ! ! কল্পনার অতীত ঘটনা বাস্তবে পরিণত হইল ! ! আহা মরি মরি ! সেই কৃপার স্মৃতিটুকু বুকে লইয়া আজ কত আনন্দে দিন কাটাইতেছি ; কিন্তু মনে

ইহার ভিতর একটা বড় খট্‌কা বাঁধিয়া গেল। এখন কি করি? কিছুদিন হইতে ত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটি কখনও কখনও এক আধটুকু চাহিয়া দেখিতে ছিলাম, এখন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুইত সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। এখন কি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটিই চিন্তা বা ধ্যান করি, না কি শ্রীশ্রীপ্রভুর মূর্ত্তিটিই চিন্তা করিব! একবার মনে হয়, কৃষ্ণ মূর্ত্তিটি ধ্যান করাই ভাল। আবার মনে হয়, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুই যখন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন, তখন ইনিই ত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব, প্রভুর মূর্ত্তিটি ধ্যান করিলেই সব হইল। কি করি, মন ত দুইটিই চায়; বরং পূর্ব্বটিতেই যেন টান একটু বেশী। পূর্ব্বটি বাদ দিয়া আর বর্ত্তমানটি ভাল লাগে না। কি করি? বিষম সমস্যায় পড়িয়া একদিন গভীর রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছি। একবার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির দিকে আবার শ্রীশ্রীপ্রভুর চিত্রপটের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি—কত কি ভাবিতেছি।

গভীর রাত্রি, দিগন্ত নিস্তব্ধ। কোথাও সাড়াশব্দটি নাই। অনন্ত আঁধারে আবৃত নীরব নিস্পন্দ পৃথিবীর ভিতর আমিই একা যেন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছি। আর সব আছে কিনা, জগৎটা আছে, কিনা? কে কার সংবাদ লইতে যায়? কেবল একই চিন্তা—শ্যাম রাখি, কি কূল রাখি!!

অকস্মাৎ নীরব নিশিথিনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিল!—ঐ অনতিদূরে—উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে একটি শিশুর কোমল কণ্ঠ গাহিয়া উঠিল!!—

"ভজ্‌ না কেন কাল-ছেলেটি ক্ষতি কি আছে?"

গানের সুমধুর স্বর তরঙ্গে তরঙ্গে আমার কানের ভিতর দিয়া প্রাণের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিল!! এ কি ঐন্দ্রজালিক স্বর? 'এ' স্বরের উন্মাদনায় আমাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল! গানের প্রত্যেকটি তরঙ্গ—প্রত্যেকটি বর্ণ বুকের ভিতর আসিয়া আঘাত করিতেছে, আর বুক অমনি ধরাস্ ধরাস্ করিতেছে! আমি কাণ ফেলিয়া প্রাণ ভরিয়া শুনিতে লাগিলাম,—

"ভজ্ না কেন কাল-ছেলেটি ক্ষতি কি আছে?"

আবার সেই স্বর—আবার সেই গান, প্রাণ মাতাইয়া দূর বীণাধ্বনির মত আকুল করিয়া তুলিতেছে! একে একে ঐ একই গান তিনবার হইল। কে গাহিল, কোথায় গাহিল, কেন গাহিল, কে কোথায় বসিয়া আমার মরমের কথা বীণা-বিনিন্দিত মধুরস্বরে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মুক্ত আকাশে ছড়া'য়ে দিল। কোথায় সে গায়ক, কোথায় যাইয়া তাঁহাকে আমার এই মরম সঙ্গীতের কথা জিজ্ঞাসা করিব?

সঙ্গীত থামিল। আবার যে নীরব সেই নীরব নিস্তব্ধ রজনী একাকিনী নির্জ্জনে অন্ধকার-অবগুণ্ঠনে যোগাসনে ধীর স্থির নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আপনার ভাবে বিভোর। কোথাও সারাশব্দ নাই! হা জগদ্বন্ধু হরি! তোমার একি খেলা? তুমি দৈববাণীতে বালকের কণ্ঠস্বরে আমার প্রাণের সন্দেহ ভঞ্জন করিলে! কি দয়া! কি অনন্ত করুণা! কি অযাচিত কৃপা! আহা! তুমি আমার মত অধমের জন্য এতও কি কষ্ট স্বীকার করিয়া থাক?

পাঠক মহাশয়! এই অপূর্ব্ব দৈববাণীত আমার নিদ্রিত অবস্থার স্বপ্ন নয়, এ জাগ্রত স্বপ্ন !! কি আশ্চর্য্য ! যে উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে একাদিক্রমে তিনবার করিয়া সঙ্গীতলহরী তরঙ্গে তরঙ্গে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিল, সে দিকে, যে আর কোন বাড়ী ঘরই নাই !! আজ শ্রীশ্রীপ্রভু কেমন অপূর্ব্ব দৈববাণীতে আমার প্রাণে দ্বৈধ ভাবের মীমাংসা করিয়া দিলেন, জয় জগদ্বন্ধু হরি ! জয় তোমার মহা উদ্ধারণলীলা !

শেষ মীমাংসা।

দৈববাণীর দুই একদিন পরেই একদা অপরাহ্নে রোগী দেখিতে যাইতে যাইতে চিন্তা করিতেছি 'দৈববাণীতে যদিও কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ধ্যানের কথাই প্রভু জানাইয়া দিলেন, তথাপি মনের খট্‌কা ত মিটে না !! কেন না শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুতেই যখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন হইল, তখন বর্ত্তমান বাদ দিয়া অতীতের রূপ চিন্তা করাটা কি ভাল ? শ্রীহরি জীব উদ্ধারের নিমিত্ত জগদ্বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ তত্ত্বটি যখন অভ্রান্তরূপে জানাইলেন, তখন আর বর্ত্তমান বাদ দিয়া অতীত রূপ লইয়া বিগ্রহ সেবাতে প্রয়োজন কি ? তিনি বর্ত্তমান বসিয়া রহিয়াছেন, সেবার জিনিস দিলে হাতে করিয়া তুলিয়া খাইবেন, তুলসী চন্দন দিলে স্বয়ংই চরণে লইবেন, এ সুখে বঞ্চিত হইয়া কি শুধু বিগ্রহের নিকট ভোগ নিবেদন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিব ? কৃষ্ণাবতারের সময় গোপ গোপীগণ কি মুখে তুলয়া

দিয়া সেবা করিয়াছেন, না কি বিগ্রহের নিকট ভোগ নিবেদন করিয়াছেন? গৌরাঙ্গ-লীলার সময় ভক্তগণ, গৌরকে মুখে তুলিয়া দিয়া খাওয়াইয়াছেন, না কি গৌরের মূর্ত্তির নিকট ভোগ নিবেদন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন? বিগ্রহের নিকট ভোগ নিবেদন—অপ্রকট অবস্থায় ব্যবস্থা। প্রকট অবস্থায় সাক্ষাৎ সেবা ভিন্ন আর কর্ত্তব্য কি? আনন্দই বা কোথায়?

শ্রীশ্রীপ্রভু দয়া করিয়া যখন তাঁহার তত্ত্বটি অভ্রান্তরূপে জানাইলেন,—বুঝাইলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই যখন জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য জগদ্বন্ধুরূপে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার বর্ত্তমান রূপ ধ্যান না করিয়া, বর্ত্তমান নামটি জপ না করিয়া, বর্ত্তমানে সেবার জিনিস মুখে তুলিয়া না দিয়া অতীতের বিগ্রহমূর্ত্তির নিকট শুধু নিবেদন ক'রে ও প্রসাদ পে'য়ে শান্তি কি—আনন্দ কোথায়? বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া আর পৃথক্‌ভাবে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির ধ্যান ধারণা করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া পাল্কীতে অর্দ্ধশায়িতভাবে রহিয়াছি,—বেহারাগণ উচ্চৈঃস্বরে স্বভাবসুলভ শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়া জাগ্রতস্বপনে বেহারাদিগের শব্দে শুনিতেছি,—গোবিন্দ-পদ বিমুখম্—গোবিন্দপদ বিমুখম্—গোবিন্দপদ বিমুখম্—গোবিন্দপদ বিমুখম্! শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলাম!—একি? ওঃ! তাইত—আমি রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তির দরকার কি মনে করিয়া বাস্তবিকইত গোবিন্দকে উপেক্ষা করিয়া গোবিন্দপদ বিমুখই হইয়াছি!! রাধাকৃষ্ণের অনাবশ্যকতা মনে না করিয়া, শ্রীশ্রীপ্রভুতে সেই যুগল মাধুরী অভেদ মনে

করাই সঙ্গত ছিল। ভাবিতে ভাবিতে আবার তন্দ্রা—আবার বেহারাদের শব্দ অপূর্ব্বভাবে মহানামে পরিণত হইয়া কাণের ভিতর দিয়া প্রাণে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"সর্ব্বময় জগৎবন্ধু" !! অমনি আবার চমকিয়া উঠিলাম! একি? বেহারাদের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া বলিতেছে—"সর্ব্বময় জগদ্বন্ধু !!" তাইত, এবার সব ঠিক হইয়া গেল!—শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুই সর্ব্বময় !! ইনিই সব, ইঁহার ধ্যান ও ইঁহার নাম করিলেই রাধাকৃষ্ণ ধ্যান ও রাধাকৃষ্ণের নাম করা হইয়া যাইবে। এবার প্রভুর কৃপায় শেষ মীমাংসা হইল, গোল ঘুচিল, খট্‌কা মিটিল—শান্তি—শান্তি—শান্তি !! ইহার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম,—শ্রীশ্রীপ্রভু ত্রিকালগ্রন্থে আপনার জগদ্বন্ধু নামকে মহানাম, ও মহানামের মহাউদ্ধারণশক্তিকে চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন তুল্য লিখিয়াছেন। আহা মরি মরি! মহানাম কি অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন !! চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তনে (রাধাকৃষ্ণ, নিতাইগৌর প্রভৃতি নাম কীর্ত্তনে) যে ফল, একবার মাত্র জগদ্বন্ধু নামটি উচ্চারণেও সেই ফল !! এবার আমরা কলির জীব যেমন মহাপাপী, আমাদের উদ্ধারের জন্য তেমন মহাশক্তি-সম্পন্ন জগদ্বন্ধু নাম। শ্রীশ্রীপ্রভু আপনার মহানামকে চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তনতুল্য বলাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে—একমাত্র জগদ্বন্ধু নাম লইলে রাধাকৃষ্ণ নাম নিতাইগৌর নাম, হরিনাম প্রভৃতি সবই উচ্চারণ করা হয়। শ্রীশ্রীপ্রভু আজ বেহারার শব্দেও আপনার মহানামে রাধাকৃষ্ণ নামের অভেদ তত্ত্বই বুঝাইলেন। জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় মহাউদ্ধারণ লীলা!

মহানামের শক্তি-পরীক্ষা

ও

ঘুরাফিরা বন্ধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমি নানা সাধুসন্ন্যাসীর নিকট ছুটিতাম। আজ একটি অপূর্ব্ব ঘটনাতে শ্রীশ্রীপ্রভু আপনার মহানামের মহা মাহাত্ম্য অনুভব করাইয়া ছুটাছুটির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দিলেন।

আজ স্বপ্নে আমার পূর্ব্বপরিচিত কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট গিয়াছি। ইঁহাকে আমি প্রাণের সহিত খুব ভক্তি করি। ইনি বাস্তবিকই একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। ইঁহার এমনই অপূর্ব্ব ক্ষমতা যে, কাছে যাওয়ামাত্র প্রাণের সমস্ত গূঢ় কথা টক্ টক্ করিয়া বলিয়া দিয়া থাকেন। এসব ঘটনা আমি নিজে ভুক্তভোগী। ইতিপূর্ব্বে আমাকে শিষ্য করিতে ইঁহারও প্রাণের ইচ্ছা হইয়াছিল।

স্বপনের ঘোরে আমি আজ তাঁহার নিকট গিয়াছি, তিনি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়রূপে তেমনি করিয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে অচল অটলভাবে যোগাসনে বসিয়া আছেন। ইনি আজ আমাকে দেখিবামাত্রই একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠি-লেন! মুহুর্ম্মুহু ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি যতই গর্জ্জন করিতেছেন, ততই আমার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা

উপস্থিত হইতেছে! উঃ কি ভয়ানক যন্ত্রণা!! আমার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যেন পিঠের পাঁজরের সহিত নিস্পিষ্ট হইতে লাগিল! আর ত সহ্য হয় না, আর ত বাঁচি না! প্রাণ যে যায়!! উঃ কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা!! যোগের বিভূতি কি অসীম শক্তিসম্পন্ন!! তিনি মুখে কিছু বলিতেছেন না, হাতেও মারিতেছেন না, কেবল আমার দিকে চাহিয়া ক্রোধে অব্যক্ত স্বরে গর্জ্জন করিতেছেন! হায়! প্রাণ এবার নিশ্চয়ই বাহির হইয়া গেল! বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া পিঠের হাড়ের সহিত মিশিয়া নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে!! আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম—

"আপনি এত রাগ করেন কেন? প্রভু জগদ্বন্ধুত কাহাকেও দীক্ষা দেন না, তবে আমি ঠিক জানিয়াছি—তিনিই আমার গুরু।" এই কথা বলিবামাত্রই, উক্ত মহাপুরুষ ক্রোধে লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তুই এখনই এখান হইতে দূরহ!"

আস্তে আস্তে মরার মত—ঠিক যেন শৃগালের মত তথা হইতে উঠিয়া চলিলাম। যাইবার সময় সেই স্থানে একটি জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল; তিনি বলিলেন,—দেখ্! সাবধান!—আর কখনও ইঁহাদের নিকট আসিস্ না। আমি কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, জয় জগদ্বন্ধু, জয় জগদ্বন্ধু! বলিতে বলিতে একটী সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া চলিলাম।

কি আশ্চর্য্য! কি অপূর্ব্ব যোগৈশ্বর্য্য! কি অদ্ভুত বিভূতি!! আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য,—একেবারে লয় করিবার জন্য, কত ঝড়, কত বিভূতি, কত প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার গভীর গর্জ্জনে

ব্রহ্মাণ্ড বধির করিয়া আসিতে লাগিল !! কিন্তু মহানামের মহাশক্তিতে এখন আমার প্রাণে অপূর্ব্ব বল আসিয়াছে। মনে হইতেছে প্রভুর নাম স্মরণ থাকিতে, ব্রহ্মাণ্ড লয় হইয়া গেলেও আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে কার সাধ্য ? কার্য্যেও তাহাই হইল—তখন সব প্রলয়কাণ্ড উপেক্ষা করিয়া অদম্য সাহসের সহিত জয় জগদ্বন্ধু ! জয় জগদ্বন্ধু ! বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ! এত সব প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার, গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমাকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, সব আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াই এপাশ ওপাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি মহানাম করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইতে দেখাইতে সব উপেক্ষা করিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইতেছি !

অকস্মাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ! স্বপ্নের সব ঘটনা তখনও প্রাণের ভিতরে পূর্ণবেগে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। হা প্রভো ! তোমার অপার করুণা কে বুঝিবে ? আজ অধমের প্রতি অযাচিত কৃপায় নানা স্থানে ঘুরিবার ফিরিবার মজাটা বেশ করিয়া দেখাইয়া চিরদিনের মত ছুটাছুটি বন্ধ করিয়া দিলে, অন্য দিকে মহানামের মহা মহিমা দেখাইলে—মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ করিয়া অনুভব করাইয়া দিলে,—মহানাম স্মরণ থাকিলে মহাপ্রলয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হইয়া গেলেও কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না।

আমি ইতিপূর্ব্বে নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর নিকট যাইতাম। কিন্তু এরূপ ছুটা ছুটিতে যে, অনিষ্টের আশঙ্কাই বেশী

তাহা কখনও বুঝিতে পারি নাই; তাই প্রভুরএই অপূর্ব্ব বিধান! ঠিক এই সময়েই রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি, এল মহাশয় একদিন আমার বাসায় উপস্থিত হইয়া অযাচিতভাবে, বলিতে লাগিলেন,—নানা স্থানে নানা মহাপুরুষের নিকট যাতায়াত ভাল নহে। এই কথার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তাঁহার একটি বন্ধুর বিপদের কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহার বন্ধুটি নানা স্থানে যাওয়ার ফলে হঠাৎ বিপন্ন হইয়া পড়েন।

"একদিন এক মহাপুরুষের নিকট যাওয়াতে তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"তোর আধারটিত বড় ভাল! তবে তুই যে ভাবে কাজ করিতেছিস,—ও ভাবে নয়,—এই ভাবে,"—বলিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিলেন। তখন হইতে ভক্তটির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল, ক্রমে সম্পূর্ণ দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইল, কোন চিকিৎসায় কিছু হইল না। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া শুইয়া তাঁহার আবার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হওয়াতে, অনুতপ্ত হৃদয়ে ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ইনি প্রায়ই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন। আজ কাঁদিতে কাঁদিতে ইষ্ট মূর্ত্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, অকস্মাৎ গৃহ আলোকিত হইল,—অভীষ্ট ইষ্ট মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং যেখানে সেখানে যাওয়ার ফলে যে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাও বলিয়া দিলেন। রজনী সুপ্রভাত হইলে, দুরারোগ্য মৃত্যুব্যাধি দেখিতে দেখিতে সারিয়া গেল।

উকীল বাবুর বর্ণনাটিতে আমার স্বপ্নের ঘটনাটি,—হৃদয়ে আরও দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিল। যেখানে সেখানে যাওয়াটা যে খুব অন্যায় তাহা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বিশেষভাবে বদ্ধমূল হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলাম,—ঠিক একনিষ্ঠ-ভাব না হইলে বাস্তবিক কোন ফলই হয় না; বরং পদে পদেই বিপদ্। আজ এই অদ্ভুত স্বপ্নে শ্রীশ্রীপ্রভু, একদিকে একনিষ্ঠ ভাবটি হৃদয়ে আঁকিয়া দিলেন, অন্য দিকে মহানামের মহাশক্তি অনুভব করাইয়া প্রাণের সমস্ত গোল মিটাইয়া দিলেন। জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় মহাউদ্ধারণ লীলা!!

আমার স্থৈর্য্য সম্পাদন

কিছুদিন পরে বড় আদরের মেয়েটি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইল। এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন, সব্ এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ সমস্ত মিলিয়া পাঁচ সাত জনে অবিরত দেখিয়া শুনিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। ঘোরতর সন্নিপাতজ্বর। ব্যাধি কিছুতেই কমিল না, ক্রমে মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিন শরীরটা নীলাভ হইল, শ্বাস কষ্ট বেশী হইল, পেট ফাঁপাত লেগেই আছে,—আজ একেবারে মৃত্যু স্থিরনিশ্চয় জানিয়া সেই শোচনীয় সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দুর্ব্বল মন অত্যন্ত চঞ্চল, রাত্রি খুব বেশী হইয়াছে, আমি আর বসিয়া

থাকিতে পারিতেছি না, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোগীর পাশে বসিল, আমি ঐ স্থানেই একটু শুইলাম। শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি,—আমি কোন একটা জঙ্গলের ভিতর গিয়াছি, যাইয়া দাঁড়ানমাত্রই দুইটা ভয়ঙ্কর গোখুরা সাপ প্রকাণ্ড ফণা বিস্তার করিয়া আমাকে এমনি ভাবে আক্রমণ করিল, যে আমার আর সরিবার বা নড়িবার যো রহিল না। একটা আমার বুকের কাছে,—ঠিক পাঁচ সাত আঙ্গুল তফাতে ফণা বিস্তার করিয়া দুলিয়া দুলিয়া গর্জ্জন করিতেছে, আর একটা ঠিক আমার পায়ের কাছে ফণা বিস্তার করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে! একযোগে দুইটা সাক্ষাৎ যমের হাতে পড়িয়া আমার একেবারে আক্কেল গুড়ুম!! এই বিপদের সময় হঠাৎ মনে হইল—খুব স্থিরভাবে থাকিতে পারিলে সাপে দংশন করেনা। অমনি আমি একেবার কাষ্ঠপুত্তলিকার মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; সাপ দুইটা ঠিক একইভাবে গর্জ্জন করিতে লাগিল, এখনও দংশন করিল না বলিয়া যেন একটু সাহস হইল,—এইভাবে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলে বোধ হয়, বাঁচিতেও পারি।

দুইটা ভয়ঙ্কর নাগপাশে বদ্ধ হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছি, এই অবস্থায়

শ্রীশ্রীপ্রভুর উপদেশ!—

"দেখ! সংসারে বহু বিপদ্ আসে আর যায়, কিন্তু এই ভাবে স্থির থাকিতে পারিলে দংশন করিতে পারে না—

কেবল গর্জ্জন।"

ইহার পরে প্রভু, খুঁকীকে দেখিতে চলিলেন, আমি পাছে পাছে গাহিতে গাহিতে চলিলাম,—

"জাগ জীবন কিশোরী নিশি অবসান হল।"

(প্রভুর রচিত শ্রীমতী সঙ্কীর্ত্তন।)

সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিতেছে। প্রভু খুঁকীর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলেন—স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! আজ মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে, তাই প্রভু এমনি করিয়া দুইটা সাপের মুখে স্থিরভাবে দাঁড় করাইয়া উপদেশ দিলেন,—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইলেন—সংসারে বহু বিপদ্ আসে আর যায়, কিন্তু এমনি করিয়া স্থির থাকিতে পারিলে দংশন করিতে পারে না, কেবল গর্জ্জন! কি অপূর্ব্ব সান্ত্বনা! ধৈর্য্য সম্পাদনের কি অপূর্ব্ব অনুভূতি! হায়! জগতে আমার এমন বান্ধব আর কে আছে? কে এই বিপদের দিনে, আমার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া এই প্রাণারাম বরাভয় দিয়া স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া দিতে পারে? কে পারে? যিনি জগতের একমাত্র বন্ধু সেই জগদুদ্ধারণ একমাত্র হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু—আমার প্রাণ-বন্ধু—বিপদের বন্ধু বিপদ্ বারণ মধুসূদনরূপে দাঁড়াইয়া সব দুঃখ দূর করিয়াদিলেন! খুঁকী দেখিতে দেখিতে দুই তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিয়া বসিল—আবার হাসিল—জয় জগদ্বন্ধু নাম প্রাণ ভরিয়া গাহিল! শান্তি—শান্তি—শান্তি! জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় মহা-উদ্ধারণ লীলা!

আমার-মৎস্য ত্যাগ।

শ্রীশ্রীপ্রভু অপূর্ব্ব কৃপায় হাতীকে দিয়া হাতে গোমাংস দেওয়াইয়া যেরূপে আমার মৎস্য ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন তাহা পূর্ব্বে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছি। (৩য় খণ্ড—১৪৩-৪৪ পৃঃ)। আহা প্রেমময়ের এসব অযাচিত করুণার কথা স্মরণ করিলে কোন্ পাষাণের হৃদয় না বিগলিত হয়? হায় প্রভো! তুমি জীবের জন্য এত কষ্ট সহিয়া থাক, জীবকে পাপতাপের নরক হইতে ধুইয়া মুছিয়া কোলে তুলিয়া লইতে কত কৌশল বিস্তার করিয়া থাক!! ধন্য তোমার মহাউদ্ধারণ প্রেমলীলা!! জয় জগদ্বন্ধু হরি!

বিষয়ে ডুবিয়া অনাসক্ত থাকা কঠিন ব্যাপার।

আমরা বিষয়াসক্ত হইয়াও, অনেক সময় মনে করি—রাজর্ষি জনকের মত নির্লিপ্ত সংসারী হইতে পারিলে, খুব ভাল! কিন্তু একবারও চিন্তা করি না, আমাদের এ কল্পনা পাগলের প্রলাপ বই আর কিছুই নহে। মাঝে মাঝে দুই এক দিন আমার মনে এইরূপ কল্পনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীপ্রভু কৃপা করিয়া এ ভ্রমটি নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন করিয়া দিলেন।

একদিন স্বপ্নের ঘোরে কোন দূরবর্ত্তী আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়াছি। রাত্রিতে সে বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব লইয়া যাইতেছে। বাড়ীর সকলে আকস্মিক বিপদে খুব

ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, আমি শুধু প্রাণটি লইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছি। এ বাড়ীর বিষয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধও নাই, কাজেই সে সব অপহৃত হওয়ার জন্যও আমার কোন কষ্ট নাই ! আমার চিন্তা শুধু পলায়ন করিয়া ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া। আস্তে আস্তে পাছদুয়ার দিয়া পলাইয়া বাহির হইলাম। এই অবস্থায়—

শ্রীশ্রীপ্রভুর উপদেশ—

"বিষয়ের ভিতরে থাকাত নিরাপদ নহেই, তদ্ভিন্ন যেখানে বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সেখান হইতেও এইরূপে পলাইয়া বাহির হইলে তবে শান্তি।—তবে নিরাপদ।" ঠিক কথা !—বিষয় বিষ! যেখানে বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তথায়ও উহার সংস্রবে থাকিলে, সর্ব্বদা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। আমার মত জীবের নির্লিপ্ত সংসারী হওয়ার অভিমানটী প্রভু চূর্ণ করিয়া—বিষয় বিষে ডুবিয়া অনাসক্ত থাকা যে অতি কঠিন ব্যাপার, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বলুন দেখি, কে এমন করিয়া অমৃতোপম উপদেশগুলি প্রাণের নিভৃত প্রদেশে অনুভব করাইয়া চির-দিনের মত হৃদয়ফলকে আঁকিয়া দিতে পারে ? কে পারে ? যিনি আমার মত পতিত জীবের পরিত্রাতা, তিনি জীবো-দ্ধারের জন্য সব পারেন, জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সব করেন। আমার মত পতিত জীবের প্রতি আজ তাই শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাউদ্ধরাণ লীলার এই অযাচিত করুণা-কণিকা সিঞ্চন ! জয় জগদ্বন্ধু হরি ! জয় মহাউদ্ধারণ লীলা !!

পার্থিব ব্যাপারে শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপা।

১৩২২ সালে আমার চিকিৎসালয়ের হাল খাতার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বাসাস্থ কূপের জল শুকাইয়া গেল। কূপে সামান্য সামান্য কাদাজল দুই চার বাল্‌তি উঠে মাত্র। হাল খাতার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা। বাধ্য হইয়া আমরা ভারী দিয়া জল আনার বন্দোবস্ত করিয়াছি। হাল খাতার পূর্ব্বদিন কামারহাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল বিশ্বাস মহাশয়, কূপের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—কা'ল কি উপায় হইবে?

শ্রীশ্রীপ্রভুর কি অপার করুণা! হাল খাতার দিন সকাল বেলা হইতে কূপে প্রচুর পরিষ্কার জল হইয়াছে দেখা গেল! সমস্ত দিন শত শত কলসী জল উঠিল। দিন রাত এই স্ফটিকের মত পরিষ্কার জলে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইল, তৎপর দিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তও একইভাবে কার্য্য চলিল; অপরাহ্ণ হইতে জল আবার কর্দ্দমাক্ত দেখা দিল!! বনোয়ারী বাবু জলের এই অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, নদীতে বোধ হয় হঠাৎ আজ খুব জোয়ার লাগিয়াছে! প্রভুর কৃপায় হাল খাতার কাজ নির্ব্বাহ হইয়া গেলে, পরদিন হইতে কূপের অবস্থা আবার পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইল।

জয় জগদ্বন্ধু হরি, জয় তোমার।

অযাচিত করুণা! আমরা কীটাণুকীট জীব, তোমার অহেতুক কৃপা কিবা জানি, কিবা বুঝি আর কিবা প্রকাশ করিব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আজ যেমন এই পতিত জীবাধম তোমার কৃপাকটাক্ষে ধন্য হইয়াছে, আবার দুই দিন পরে দেখিব,—সমস্ত জগতবাসীই এইরূপ অযাচিত করুণায় অপূর্ব্ব প্রেমামৃতের রসাস্বাদনে ধন্য হইয়া যাইবে। আজ আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া অবিরত প্রাণ ভরিয়া গাহিব—জয় জগদ্বন্ধু হরি, জয় তোমার মহাউদ্ধারণ লীলা !!

পরলোক সম্বন্ধে শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাউদ্ধারণ লীলা।

গত ১৩২২ সনের ২রা আশ্বিন আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর অযাচিত করুণায় তাঁহার পরলোক গমনটি এমন অপূর্ব্ব ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, জীবজগতে তেমনটি আর কখনও দেখি নাই।

দেহরক্ষার কয়েকদিন পরে আবার স্বপ্নে দেখিতেছি,—মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকটে মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কত কি কথা বলিতেছেন। আমি আস্তে আস্তে মন্দিরের দিকে গেলাম,—বারেন্দার নিকট যাইয়া দেখি, মন্দিরের দ্বার খোলা, —অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীপ্রভু একটি বিছানায় বসিয়া আছেন, সম্মুখে

একটি পূর্ণবয়স্কা অপরিচিতা অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি বসিয়া প্রভুর সহিত নানা কথা কহিতেছেন। আমি যাইয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া এক পাশে বসিলাম। প্রভু আমার সহিত দুই একটি কথা বলিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত মাতৃদেবীর সহিত কথা বলিতে-লাগিলেন। সেই অপূর্ব্বদর্শন মাতৃমুর্ত্তি আমার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার ছেলের যে চক্ষে ব্যায়রাম হইল, কি ঔষধ দিবে?" প্রভু একটি ঔষধের নাম বলিলেন। আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! কিন্তু একি আশ্চর্য্য? অকস্মাৎ আমার একটি চক্ষুতে যে অসহ্য বেদনা!! কৈ ইহার কিছু পূর্ব্বেত আমি বাহির হইতে আসিয়া শুইয়াছি, তখনও ত আমার চক্ষে বিন্দুমাত্র কোন অসুখ বোধকরি ছিল না!! হা প্রভো! তোমার অযাচিত করুণা সব বুঝিয়াছি! দয়া করিয়া প্রথমে দেখাইলে, —যে মা তোমার নিকট বারেন্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। তৎপর ঘরের ভিতর দেখাইলে,—মায়ের দেহরক্ষার পরের নিত্যস্বরূপ। এ মূর্ত্তিকে আমি আমার মা বলিয়া চিনিতে পারিব না,তাই মায়ের মুখে প্রভু ছেলের চক্ষের ব্যায়রামের কথা প্রকাশ করাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাল চক্ষে অসহ্য বেদনার সূচনা করিয়া দিয়া বুঝাইলেন অপরিচিতা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মূর্ত্তিতে মাতাঠাকুরাণীই দেহ-রক্ষার পরে শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণে স্থান পাইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছেন দেখাইয়া—বুঝাইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তিদান করিলেন। দেহরক্ষার পূর্ব্বেও মাতাঠাকুরাণী প্রভুর যথেষ্ট কৃপা

লাভ করিয়াছিলেন, প্রায় তিনি প্রভুকে দর্শন করিতেন। মৃত্যুর সময় শ্রীশ্রীপ্রভু হাত ধরিয়া যেন তাঁহার আপনার জনকে আনন্দে কোলে তুলিয়া লইলেন। জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় মহাউদ্ধারণ লীলা! তুমি ইহকালে জীবকে অযাচিত কৃপায় আপনার স্বরূপ আস্বাদন করাইয়া পরকালে এইরূপে আপনার প্রেমের বুকে তুলিয়া লইয়া, নিত্যদেহে নিত্যানন্দ সম্ভোগে ধন্য করাইয়া থাক।

আমার ক্রোধ উপলক্ষ করিয়া

শ্রীশ্রীপ্রভুর জীব-প্রেম প্রকাশ।

রাজবাড়ী নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়, শ্রীশ্রীপ্রভুর সম্বন্ধে বৃথা নিন্দা কুৎসা করিয়া থাকেন বলিয়া যেন, এক দিন স্বপ্নে তাঁহার সহিত খুব ঝগড়া করিতেছি। ঝগড়াতে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যা তা বলিয়া গালাগালি দিতেছি, অথচ তিনি, ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলিতেছেন। অবশেষে আমি অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কত কি বলিতে বলিতে সে স্থান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছি। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই অযাচিত কৃপাকারী শ্রীশ্রীপ্রভু আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন! আমি অবাক্ হইয়া সম্মুখীন হইতেই বলিলেন,—"এমনি করিয়া কি ক্রোধ করিতে হয়! এবার একটিকে বাদ দিলেও চলিবেনা!!" স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, শ্রীশ্রীপ্রভুর অযাচিত জীব প্রেমের কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম! কি আশ্চর্য্য! কি অযাচিত করুণা! ধন্য

প্রভো তোমার জীব-উদ্ধারণ লীলা !! তোমার যে নিন্দা-কুৎসা করিবে, গালি দিবে, তাহাকেও এবার বাদ দিবে না, তাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই !—এবার জীব-উদ্ধারণের জন্য এতই ব্যস্ত !—এতই ব্যাকুল !! একদিকে প্রভুর এই জীব-প্রেম, অন্যদিকে আবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চরিত্র সংশোধনের জন্য দেখাইলে তোমার নিন্দাকারী ব্যক্তি হইতেও কত ভক্ত নামধারী আমি কত কোপন-স্বভাব ও কত অসভ্য ! জয় জগদ্বন্ধু হরি, জয় মহা-উদ্ধারণ লীলা !!

আমার দেহাত্ম বোধ।

আমরা মায়া মুগ্ধ জীব, দেহটাকেই আমি বোধ করিয়া বসিয়া আছি। এই দেহাত্ম বোধই জীবের অষ্টপাশ। ইহা হইতেই লজ্জা, ভয়, অভিমান প্রভৃতি সব হইয়া থাকে। একদিন স্বপ্নে দেখিতেছি,—আমি, আমার দেহটা লইয়া বড়ই ব্যস্ত ! যেখানে কৃমিকীটগুলি নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, এত বড় দেহধারী হইয়া আমি তথায় যাইতে কত ভীত, কত সঙ্কুচিত ! যে নদীতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মৎস্যটি—কচ্ছপটি নির্ভয়ে সর্ব্বদা সাঁতার কাটিতেছে, কত বালক বালিকা আনন্দে স্নান করিতেছে, কাপড় কাচিতেছে, আমি, কুম্ভীরের ভয়ে, সে জলের কাছে যাইতেও সাহসী হইতেছি না। এই অবস্থার ভিতরে ফেলিয়া পরম দয়াল প্রভু আমাকে বুঝাইয়া দিলেন—

"দেহাত্ম বোধই জীবের পাশ। যে, দেহাত্ম বোধের নিগড়ে বাঁধা, সে, চিরপরাধীন। সামান্য পিপীলিকা ও

মক্ষিকার নিকটেও সে ভীত, শঙ্কিত, পরাভূত! সর্ব্বত্রই তাহার যম ও যমালয়—সর্ব্বদাই তাহার মৃত্যুভয়—সর্ব্বদাই সে আপনার দেহটা লইয়া লজ্জা, ভয় ও অভিমান প্রভৃতির কঠোর নিগড়ে বদ্ধ! এই দেহাত্মবোধ না ঘুচিলে মানুষ পাশমুক্ত হয় না,—স্বাধীন হয় না, মনুষ্যত্বের সৌরভে—সুখ-শান্তিতে ভরপূর হইতে পারে না! ছি ছি—তোর এত দুর্ব্বলতা!—সামান্য কীটপতঙ্গ যেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করে সেখানে তুই পদক্ষেপ করিতেও সাহসী হইস্ না? ভব সমুদ্র কি ক'রে পার হইবি?" স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল শ্রীশ্রীপ্রভুর অপার করুণার কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম! হা প্রভো! হা অনাথ শরণ! তুমি আমার মত পতিতকে টানিয়া তুলিতে অবিরত অযাচিত করুণায় কত কি করিয়া থাক!! জীবের জন্য কত কষ্ট সহিয়া থাক! ধন্য তোমার জীব প্রেম! জয় তোমার মহা-উদ্ধারণ লীলা!!

পাঠক মহাশয়! আমার কথা কত বলিব! এ পতিতের জন্য যে পতিতপাবন হরি, অবিরত কত কি করিতেছেন, কত কি বলিতেছেন, কত কি দেখাইতেছেন, কত কি বুঝাইতেছেন, তাহা, এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে কত লিখিব,—সে অনন্ত করুণার কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব! তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আজ এই পর্য্যন্ত আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া মহাউদ্ধারণের অনন্ত জীব প্রেমের কণিকা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইলাম, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

জয় জগদ্বন্ধু হরি! জয় মহাউদ্ধারণ লীলা!!